এডুকেশন ওয়াচ ২০১৪

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা কোন পথে?

একটি নিরীক্ষা

সারসংক্ষেপ

প্রকাশনায়
গণসাক্ষরতা অভিযান

এডুকেশন ওয়াচ ২০১৪

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা কোন পথে? একটি নিরীক্ষা

মূল প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ

সম্পাদনা

সমীর রঞ্জন নাথ
আহমদ মোশ্‌তাক রাজা চৌধুরী
মনজুর আহমদ
রাশেদা কে. চৌধূরী

জুন ২০১৫

প্রকাশনা ও সমন্বয়ে
গণসাক্ষরতা অভিযান

সহযোগিতায়
ডিএফআইডি, বাংলাদেশ

প্রথম প্রকাশ
জুন ২০১৫

গবেষণা দল: রিফাত আফরোজ, মনজুর আহমদ, কাজী সালেহ আহমদ, রাশেদা কে. চৌধূরী, আহমদ মোশ্‌তাক রাজা চৌধুরী, তানজীবা চৌধুরী, আনোয়ার হোসেন, ইফতিখার উল করিম, উৎপল মল্লিক, নওরা মেহরীন ও সমীর রঞ্জন নাথ (প্রধান গবেষক)

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

ছবি
গণসাক্ষরতা অভিযান

প্রচ্ছদ
নিত্ত চন্দ্র

আইএসবিএন: ৯৭৮-৯৮৪-৩৩-৯৪৩৫-৪

যোগাযোগের ঠিকানা
গণসাক্ষরতা অভিযান
৫/১৪ হুমায়ূন রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
ফোন: ৯১৩০৪২৭, ৫৮১৫৫০৩১-৩২, ৫৮১৫৩৪১৭
ফ্যাক্স: ৯১৩২৮৪২, ইমেইল:info@campebd.org
ওয়েবসাইট:www.campebd.org

মুদ্রণে
ম্যাস্-লাইন প্রিন্টার্স, ১/১৫ হুমায়ূন রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭

সারসংক্ষেপ

ক. পটভূমি

পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থী মূল্যায়ন প্রায় সব দেশে শিক্ষাব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অংশ। পরীক্ষার উদ্ভব হয় বহু শতাব্দী আগে, তাও আবার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বাইরে। কিন্তু শিক্ষাব্যবস্থাগুলো নিজস্ব প্রয়োজনে পরীক্ষাব্যবস্থাকে পর্যায়ক্রমে আপন করে নিয়েছে। পরীক্ষা কেবলমাত্র বিদ্যালয় কিংবা জাতীয় পর্যায়েই আয়োজন করা হয় না। আন্তর্জাতিকভাবে গৃহীত পরীক্ষাও ক্রমবর্ধমানভাবে বিস্তারলাভ করছে। চীনে হান বংশের শাসনামলে (খ্রিষ্টপূর্ব ২০৬ থেকে ২২০ খ্রিষ্টাব্দ) পরীক্ষা নেওয়ার বিষয়টি প্রথম শুরু হলেও পরবর্তী পর্যায়ে তা অনেক বিকশিত হয়েছে। পরীক্ষা পদ্ধতির উল্লেখযোগ্য বিকাশ ঘটে বিশ শতকে। ওইসিডি (OECD) দেশগুলোর আনুকূল্যে আজকের দিনে আন্তর্জাতিকভাবে যে দুটি শিক্ষার্থী মূল্যায়নব্যবস্থা ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে সেগুলো হলো, আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী মূল্যায়ন কর্মসূচি (PISA) এবং আন্তর্জাতিক গণিত ও বিজ্ঞান শিক্ষার গতিধারা (TIMSS)। এই মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় বর্তমানে বিশ্বের ৭৫টির বেশি দেশ অংশ নিচ্ছে।

মা-বাবারা সাধারণভাবে যে বিষয়টির প্রতি বেশি আগ্রহী তা হলো, তাদের ছেলেমেয়েরা বিদ্যালয় থেকে কী শিখছে? অন্য অর্থে পরীক্ষায় কেমন করছে। শিক্ষাসংক্রান্ত অংশীজনরা শিক্ষার মান নিয়ে আগ্রহী, কখনো কখনো উদ্বিগ্ন। এদের মধ্যে রয়েছেন শিক্ষাবিদ, নীতিনির্ধারক, নাগরিক সমাজ এবং গণমাধ্যম। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তাঁদের মত প্রকাশের মানদণ্ড হলো পরীক্ষার ফলাফল। শিক্ষাব্যবস্থার মান মূল্যায়নের যে নানা ধরনের কাঠামো ও প্রথা প্রচলিত রয়েছে সেগুলোতেও পরীক্ষা একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক হিসেবে বিবেচিত। যদিও সেগুলোতে শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়নে কী ধরনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে এবং সেগুলো কীভাবে বিদ্যালয় পর্যায়ে কাজ করছে তাও দেখা হয়।

জাতীয় বা আন্তর্জাতিক যে কোনো পর্যায়েই হোক পরীক্ষাগ্রহণ ও শিক্ষার্থী মূল্যায়নের বহুবিধ ব্যবস্থার ভালো ও মন্দ দিক নিয়ে প্রচুর বিতর্ক রয়েছে। শিক্ষার্থী মূল্যায়ন প্রথা শিখনের ক্ষেত্রে কী মূল্য যোগ করছে, তার ভালো-মন্দও এই বিতর্কের অংশ। এরই পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষাবিদরা মৌলিক যে প্রশ্নটি উত্থাপন করেন তা হলো, কোন বয়স থেকে শিক্ষার্থীদের বাধ্যতামূলক সর্বজনীন পরীক্ষার সম্মুখীন হওয়া উচিত। পৃথিবীর বেশিরভাগ শিক্ষাব্যবস্থায়ই বিদ্যালয়ে ১০ বছরব্যাপী শিক্ষা গ্রহণের আগে নিজ বিদ্যালয়ের বাইরে কোনো সর্বজনীন পরীক্ষা অনুমোদন করে না। কোনো কোনো দেশে এ ধরনের পরীক্ষা রয়েছে আরও পরে। অনেক দেশ নিচের শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য উচ্চমানের প্রতিযোগিতাপূর্ণ পরীক্ষা থেকে সরে যাচ্ছে। কারণ, দেখা যাচ্ছে এগুলো শিক্ষার্থীদের জন্য যতটা না উপকারী, শিখনের প্রেক্ষাপটে তার চেয়ে বেশি অপকার বয়ে আনছে।

ঐতিহাসিকভাবে বাংলাদেশে দুটি সর্বজনীন পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হতো। একটি দশম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ালেখা করার পর, অন্যটি দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষা সমাপ্তির পর। এগুলো যথাক্রমে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা নামে পরিচিত। সরকার ২০০৯ সাল থেকে দুটি নতুন সর্বজনীন পরীক্ষা চালু করেছে– একটি পাঁচ ও অপরটি আট বছরের শিক্ষা জীবন অতিবাহিত হওয়ার পর। যদিও প্রায় সব অংশগ্রহণকারীই এসব পরীক্ষায় পাশ করে, তবুও শিক্ষাবিদরা এসব পরীক্ষার যৌক্তিকতা ও এগুলো শিশু–কিশোর শিক্ষার্থীদের জীবনে কী মূল্য সংযোজন করছে তা নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করছেন। প্রাথমিক শিক্ষাচক্র সমাপ্ত হওয়ার পর মাত্র ১০ বছর বয়সী শিশুদের জন্য যে সর্বজনীন পরীক্ষার আয়োজন করা হয় তা নিয়ে তাদের সবচেয়ে বেশি আপত্তি। যে পদ্ধতিতে এই পরীক্ষা নেওয়া হয় এবং এর পরম্পরায় শিক্ষার্থীদের জীবনে কী ধরনের নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে তা নিয়েও শিক্ষাবিদদের উদ্বেগ রয়েছে।

জানা মতে, বাংলাদেশে প্রচলিত কোনো সর্বজনীন পরীক্ষার ওপর ব্যাপক কোনো গবেষণা হয়নি। এদেশের বিদ্যালয় শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়নকল্পে, এর ওপর বৈজ্ঞানিকভাবে অনুসন্ধান চালিয়ে গবেষণা ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে প্রতিবছর নীতিসংক্রান্ত সুপারিশমালাসহ নিয়মিত প্রতিবেদন প্রকাশ করতে *এডুকেশন ওয়াচ* সংকল্পবদ্ধ। গণমাধ্যম ও শিক্ষাবিদদের মাঝে সৃষ্ট উদ্বেগ বিবেচনায় নিয়ে এবং শিশুদের জন্য মজবুত ভিত্তি তৈরি করার প্রক্রিয়ায় প্রাথমিক শিক্ষাচক্রের শেষে অনুষ্ঠিত সর্বজনীন পরীক্ষার গুরুত্ব অনুধাবন করে *এডুকেশন ওয়াচ* গ্রুপ 'প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা'কে *এডুকেশন ওয়াচ* ২০১৪ এর গবেষণার মূল বিষয় হিসেবে গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সর্বসাধারণের কাছে এটি *সমাপনী পরীক্ষা* নামে পরিচিত।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এ শিক্ষার্থী মূল্যায়ন সম্পর্কে নির্দেশনা

> প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে ধারাবাহিক মূল্যায়ন এবং তৃতীয় থেকে সকল শ্রেণীতে ত্রৈমাসিক, অর্ধবার্ষিক ও বার্ষিক পরীক্ষা চালু থাকবে। পঞ্চম শ্রেণী শেষে উপজেলা/পৌরসভা/থানা (বড় বড় শহর) পর্যায়ে সকলের জন্য অভিন্ন প্রশ্নপত্রে সমাপনী পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। অষ্টম শ্রেণী শেষে আপাতত জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা নামে একটি পাবলিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে এবং এই পরীক্ষা সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বোর্ড দ্বারা পরিচালিত হবে।

সূত্র: জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ (পৃষ্ঠা ৮), শিক্ষা মন্ত্রণালয়

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পক্ষে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর উপজেলা ও জেলা পর্যায়ের কার্যালয়সমূহের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা পরিচালনা করে। প্রশ্নপত্র তৈরি, পরীক্ষা গ্রহণ প্রণালী, উত্তরপত্র মূল্যায়ন ও গ্রেড পদ্ধতি নির্ধারণের দায়িত্বে রয়েছে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি। জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষাক্রমে অন্তর্ভুক্ত ছয়টি বিষয়েই টানা ছয় দিন ধরে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। পরীক্ষার্থীদের উত্তরপত্রে প্রথমে নম্বর দেওয়া হয়, তারপর তা সাতটি অক্ষর গ্রেডে ও গ্রেড পয়েন্টে রূপান্তর করা হয়। গ্রেড পয়েন্ট গড় বা জিপিএ হিসাব করার জন্য এই গ্রেড

পয়েন্টগুলো ব্যবহৃত হয়। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা সাধারণত নভেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে অনুষ্ঠিত হয়। আর ফলাফল প্রকাশিত হয় বছরের শেষ দিকে।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের তথ্য মতে, প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার পরীক্ষার্থী সংখ্যা প্রতি বছরই বাড়ছে। ২০০৯ সালে ১৯ লাখ ৮০ হাজার শিক্ষার্থী এই পরীক্ষার জন্য নিবন্ধন করেছিল, যা ছয় বছরে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৭ লাখ ৮৯ হাজারে। কোনো বছরই নিবন্ধিত সব শিক্ষার্থী পরীক্ষা দেয়নি। ২০০৯ সালে যেখানে পরীক্ষা দিয়েছিল ১৮ লাখ ২৩ হাজার শিক্ষার্থী, ২০১৪ সালে এই সংখ্যা ছিল ২৬ লাখ ৮৪ হাজার। ছয় বছরে (২০০৯-২০১৪) মোট ১ কোটি ৪৫ লাখ ২৩ হাজার শিক্ষার্থী নিবন্ধন করেছিল। তবে প্রকৃতপক্ষে পরীক্ষায় উপস্থিত ছিল ১ কোটি ৩৬ লাখ ৩৩ হাজার শিক্ষার্থী। গড় উপস্থিতির হার প্রায় ৯৪ শতাংশ। সময়ের নিরিখে পাশের হারও বেড়েছে– ২০০৯ সালে ৮৮.৮ শতাংশ থেকে ২০১৪ সালে ৯৭.৯ শতাংশ। সার্বিকভাবে, ছয় বছরে গড়ে ৯৫.৮ শতাংশ পরীক্ষার্থী পাশ করেছে।

দক্ষিণ এশিয়ায় পাবলিক পরীক্ষার চিত্র

দেশ	শ্রেণি			
	পঞ্চম	অষ্টম	দশম	দ্বাদশ
আফগানিস্তান				✓
বাংলাদেশ	✓	✓	✓	✓
ভূটান			✓	✓
ভারত			✓	✓
মালদ্বীপ			✓	✓
নেপাল		✓	✓	✓
পাকিস্তান			✓	✓
শ্রীলংকা	বৃত্তি পরীক্ষা		(একাদশ)	(ত্রয়োদশ)

সূত্র: সংশ্লিষ্ট দেশের শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং ইউনেস্কো ২০১২

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা এখন দেশের সবচেয়ে বড় সর্বজনীন পরীক্ষা। এই পরীক্ষায় ২০১৪ সালে যত পরীক্ষার্থী অংশ নিয়েছিল তা একই বছরের নিম্ন মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার পরীক্ষার্থীসংখ্যার ১.৫৫ গুণ, মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষার পরীক্ষার্থী সংখ্যার ২.৪৭ গুণ এবং উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষার পরীক্ষার্থী সংখ্যার ২.৯৩ গুণ।

খ. গবেষণার উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি

এই গবেষণা প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার এক নিবিড় অনুসন্ধান। গবেষণায় এই পরীক্ষার ভালো ও মন্দ দিকগুলো চিহ্নিত করে আগামীদিনগুলোর জন্য প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে নীতিসংক্রান্ত সুপারিশমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। গবেষণার মূল

বিষয়বস্তুকে পারস্পরিকভাবে সম্পর্কযুক্ত নিম্নলিখিত কয়েকটি উপশিরোনামে ভাগ করা হয়েছে:

- সমাপনী পরীক্ষার পক্ষে-বিপক্ষে যুক্তিপূর্ণ মতামত
- শিক্ষাসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের চোখে সমাপনী পরীক্ষা
- পরীক্ষার ওপর গণমাধ্যমের প্রতিবেদন ও প্রতিক্রিয়া
- শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা প্রস্তুতির জন্য বিদ্যালয়গুলোর উদ্যোগ
- সমাপনী পরীক্ষার প্রস্তুতিতে শিক্ষার্থীদের পরিবারের সাড়া
- সমাপনী পরীক্ষা পরিচালন পদ্ধতি
- সার্বিকভাবে পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষা ও অতিরিক্ত পাঠের জন্য ব্যক্তিখাতে খরচ
- সমাপনী পরীক্ষার ফলাফল ও এর সঙ্গে প্রান্তিক যোগ্যতা অর্জনের সম্পর্ক

উপর্যুক্ত বিষয়ে অনুসন্ধান পরিচালনার জন্য এই গবেষণায় পাঁচ ধরনের প্রাথমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নেওয়া হয়েছে। এগুলো হলো সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, নতুন জাতীয়করণকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয়, কিন্ডারগার্টেন, উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয় ও এবতেদায়ি মাদ্রাসা। বাংলাদেশে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের প্রায় ৯০ শতাংশ এই পাঁচ ধরনের বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয় এবং গবেষণার জন্য নির্বাচিত এলাকার এনজিওদের কাছে প্রাপ্ত তালিকা থেকে গবেষণার জন্য বিদ্যালয় নমুনায়ন করা হয়েছে।

গবেষণার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য গুণবাচক ও পরিমাণবাচক উভয় পদ্ধতিই ব্যবহার করা হয়েছে। পরিমাণবাচক অংশে পুরো বাংলাদেশকে দুইভাগে ভাগ করা হয়েছে– গ্রামীণ ও শহর। গ্রামীণ এলাকার জন্য নিয়মানুগ দৈবচয়ন পদ্ধতি ব্যবহার করে ৭৫টি উপজেলা নির্বাচন করা হয়। শহর এলাকার জন্য একই পদ্ধতিতে সমসংখ্যক থানা/পৌরসভা নির্বাচন করা হয়। গবেষণার জন্য সর্বমোট

১৫০টি উপজেলা/থানা/পৌরসভা নির্বাচন করা হয়। উপজেলাগুলো থেকে পাঁচ ধরনের মোট ৫৭৮টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান দৈবচয়নের মাধ্যমে নির্বাচন করা হয়, এর মধ্যে ৩২৬টি গ্রামীণ এলাকা থেকে ও ২৫২টি শহর এলাকা থেকে। সমাপনী পরীক্ষার্থীদের প্রস্তুতিতে বিদ্যালয়গুলো কী কী উদ্যোগ নিচ্ছে তার তথ্য একটি পূর্বনির্ধারিত প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে প্রধান শিক্ষকদের কাছ থেকে সংগ্রহ করা হয়।

সমাপনী পরীক্ষার্থী জরিপের জন্য উপর্যুক্ত নির্বাচিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো থেকে ৩০৯টি প্রতিষ্ঠান পুনরায় নির্বাচন করা হয়, যার মধ্যে ১৮০টি গ্রামীণ এলাকার ও ১২৯টি শহর এলাকার। প্রতিটি প্রতিষ্ঠান থেকে ২০ জন সমাপনী পরীক্ষার্থী (১০ জন মেয়ে ও ১০ জন ছেলে) দৈবচয়নের মাধ্যমে নির্বাচন করা হয়। এদেরকে অন্য একটি প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে জরিপ করা হয়। জরিপের বিষয়বস্তু ছিল তাদের পড়ালেখা, পরীক্ষার প্রস্তুতি, ব্যক্তিখাতে শিক্ষা ব্যয় ও আর্থসামাজিক পরিস্থিতি। যদিও পরীক্ষার্থীরাই ছিল মূল উত্তরদাতা কিন্তু মা-বাবারাও প্রয়োজনমতো তাদের

সাহায্য করেছেন। এই শিক্ষার্থীদের যোগ্যতাভিত্তিক মূল্যায়ন পরীক্ষাও নেওয়া হয়। নমুনাকৃত মোট পরীক্ষার্থী সংখ্যা ৫,৩৭৫ জন, যাদের মধ্যে মেয়ে ও ছেলের সংখ্যা প্রায় সমান।

গবেষণার গুণবাচক অংশ পরিচালিত হয়েছে তিনটি উপজেলা ও একটি থানায়। নিবিড় সাক্ষাৎকারগ্রহণ ও বিষয়ভিত্তিক দলীয় আলোচনা করার জন্য এতে বেশ কিছু সংখ্যক চেকলিস্ট ব্যবহৃত হয়। উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা ও তাদের সহকারীবৃন্দ এবং প্রধান শিক্ষক ও শ্রেণি শিক্ষকবৃন্দের নিবিড় সাক্ষাৎকারগ্রহণ করা হয়। অপরদিকে, বর্তমান ও আগের বছরের পরীক্ষার্থী এবং তাদের মা-বাবার সঙ্গে বিষয়ভিত্তিক দলীয় আলোচনা করা হয়। তা ছাড়াও শ্রেণিকক্ষ কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করার জন্য আলাদা একটি চেকলিস্ট ব্যবহার করা হয়।

প্রধান শিক্ষকদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয় তাদের কার্যালয়ে। শিক্ষার্থীদের যোগ্যতাভিত্তিক মূল্যায়ন পরীক্ষা নেওয়া হয় তাদের শ্রেণিকক্ষে আর সাক্ষাৎকারগ্রহণ করা হয় নিজ নিজ বাড়িতে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত একদল গবেষণা সহকারী গবেষক দলের তত্ত্বাবধানে এসব তথ্যসংগ্রহ করেন। গবেষণার বেশিরভাগ তথ্য ২০১৪ সালের পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে তবে অল্প কিছু ক্ষেত্রে উত্তরদাতারা পুরানো অভিজ্ঞতাও ব্যক্ত করেছেন। গবেষণার মাঠ কার্যক্রম পরিচালিত হয় ২৪শে অক্টোবর থেকে ২২শে ডিসেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত।

গ. গবেষণার ফলাফল

১. পরীক্ষা পরিচালন পদ্ধতি

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা কীভাবে প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে তা বোঝার জন্য মাঠ পর্যায়ে এই পরীক্ষা কীভাবে অনুষ্ঠিত হয় তা জানা খুব জরুরি। এই অংশে সমাপনী পরীক্ষাগ্রহণ প্রক্রিয়া তুলে ধরা হলো।

- প্রতি বছর পরীক্ষার্থীদের নিবন্ধন শুরু হয় মার্চ-এপ্রিল মাসে আর তা শেষ হয় আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে। বিদ্যালয় এবং উপজেলা ও জেলা পর্যায়ের শিক্ষা অফিসসমূহ এ কাজে যুক্ত থাকে। পরীক্ষার্থীপ্রতি নিবন্ধন ফি ৬০ টাকা। কিন্তু সব পরীক্ষার্থী সমপরিমাণ টাকা দেয়নি। চৌষট্টি শতাংশ পরীক্ষার্থী নিবন্ধনের জন্য ৬০ টাকাই দিয়েছিল। কিন্তু ৩৪.৩ শতাংশ পরীক্ষার্থীকে এর চেয়ে বেশি টাকা দিতে হয়েছিল, যা সর্বোচ্চ ৬০০ টাকা। অবশ্য খুব অল্পসংখ্যক পরীক্ষার্থীকেই এত বেশি টাকা দিতে হয়েছিল। তুলনামূলকভাবে কিন্ডারগার্টেনগুলো পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে নিবন্ধনের জন্য বেশি ফি নিয়েছিল।
- প্রতি ইউনিয়নে একটি করে পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপিত হয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে উচ্চ বিদ্যালয়সংলগ্ন প্রাথমিক বিদ্যালয় এর জন্য বেছে নেওয়া হয়। পরীক্ষার হল পরিদর্শকদের মূলত নেওয়া হয়েছিল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে

এবং কোনো পরিদর্শককেই তার নিজ ইউনিয়নে দায়িত্ব দেওয়া হয়নি। তাদের জন্য উপজেলা পর্যায়ে অবহিতকরণ সভার আয়োজন করা হয়েছিল। প্রতি বিষয়ের জন্য তিন স্তরের পরীক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল। এরা হলেন প্রধান পরীক্ষক, সহকারী প্রধান পরীক্ষক ও পরীক্ষক। পরীক্ষক সংখ্যা নির্ধারিত হয়েছিল পরীক্ষার্থী সংখ্যার ওপর ভিত্তি করে– প্রতি ২০০টি উত্তরপত্র মূল্যায়ন করার জন্য একজন পরীক্ষক। পরীক্ষকদের জন্য সপ্তাহব্যাপী প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছিল। পরীক্ষাসংক্রান্ত কাজের চাপ ও নিম্ন পারিতোষিকের ব্যাপারে কয়েকজন পরিদর্শক ও পরীক্ষক তাদের অসন্তুষ্টির কথা জানিয়েছেন।

- নিবন্ধনের সময়ই পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষার হলে বসার বিন্যাস বিষয়ে বিদ্যালয়গুলো নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিল। তারা 'দুর্বল' পরীক্ষার্থীদের 'সবলদের' মাঝখানে রেখে তালিকা তৈরি করে উপজেলা অফিসে পাঠিয়েছিল। উপজেলা অফিস থেকে এর কোনো পরিবর্তন করা হয়নি এবং হল কর্মকর্তারাও একই কাজ করেছিলেন। এর ফলে পরীক্ষার সময় 'সবলদের' কাছ থেকে সহযোগিতা নিতে 'দুর্বল' পরীক্ষার্থীদের জন্য সুযোগ তৈরি হয়েছিল। হল সুপার ও উপজেলা কর্মকর্তারা ব্যাপারটি জানতেন। কিন্তু এ ব্যাপারে তাদের করার কিছু ছিল না। পরীক্ষার হলে ছেলে ও মেয়েরা আলাদা বসেছিল। আবার বিদ্যালয় ও মাদ্রাসার পরীক্ষার্থীরা পৃথক কক্ষে বসে পরীক্ষা দিয়েছিল।
- পরীক্ষার সময় বেশিরভাগ পরীক্ষার্থী (৬০-৬৫ শতাংশ) অপরের সাহায্য ছাড়াই নিজ নিজ পরীক্ষা দিয়েছে। তবে যাদের সাহায্য দরকার ছিল তাদের জন্য সাহায্যের দ্বারও উন্মুক্ত ছিল। পরিদর্শকরা পরীক্ষার হলে মুঠোফোন বহন করছিলেন এবং ক্ষুদ্র বার্তার মাধ্যমে হলের বাইরে থেকে প্রশ্নের উত্তর সংগ্রহ করছিলেন। তারা প্রশ্নের উত্তর বলে দিয়ে বা ব্ল্যাকবোর্ডে লিখে দিয়ে পরীক্ষার্থীদের সাহায্য করছিলেন। পরীক্ষার্থীরা যেন একে অন্যের উত্তরপত্র দেখে লিখতে পারে, পরিদর্শকরা সে সুযোগও করে দিয়েছিলেন। যেসব পরীক্ষার্থীর অপরের কাছ থেকে কোনো সাহায্যের প্রয়োজন ছিল না, তারাও নিজের উত্তরপত্র দেখিয়ে বন্ধুদের সহযোগিতা করছিল। আড়াই ঘণ্টার প্রতিটি পরীক্ষার শেষ ৪০ মিনিট থেকে এক ঘণ্টা পুরো পরীক্ষার হলে এক ধরনের অরাজক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল। এ সময় পরীক্ষার্থীরা একে অন্যের সঙ্গে প্রশ্নের উত্তর মিলাচ্ছিল এবং দেখে দেখে লিখছিল।
- প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি থেকে যেরকম প্রশিক্ষণ ও নির্দেশনা দেওয়া হয়েছিল তা অনুসরণ করে পরীক্ষকরা বেশ উদারভাবে উত্তরপত্র মূল্যায়ন করেছেন। অনেক পরীক্ষকই বিষয়টি মেনে নিতে পারছিলেন না এবং এ প্রসঙ্গে তাদের অসন্তুষ্টির কথা প্রকাশ করছিলেন। কিন্তু তাদের প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমির নিয়ম অনুসরণ করেই উত্তরপত্র মূল্যায়ন করতে হচ্ছিল। পাশের হার

বাড়ানোর উদ্দেশ্যে অনেক পরীক্ষার্থীর নম্বর বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। সময়-স্বল্পতার কারণে উত্তরপত্র মূল্যায়ন পরীক্ষকদের কাছে বাড়তি চাপ মনে হয়েছে।

- উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তারা দাবি করেছেন যে, তাদের দিক থেকে প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার কোনো সুযোগ ছিল না। তারা এ জন্য জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি ও বাংলাদেশ সরকারি ছাপাখানা (বিজি প্রেস)কে দায়ী করেছেন। এরা যথাক্রমে প্রশ্নপত্র তৈরি এবং ছাপানো ও বিতরণের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল।

২. পরীক্ষার্থীদের প্রস্তুতিতে বিদ্যালয়ের উদ্যোগ

শিখনের বিকাশ ঘটানোই শিক্ষাব্যবস্থার মূল কাজ। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার জন্য বিদ্যালয়গুলো পরীক্ষার্থীদের কীভাবে প্রস্তুত করে তা এ অংশে সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরা হলো।

- বিদ্যালয় পর্যায়ে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার প্রস্তুতি শুরু হয় পরীক্ষার্থী নির্বাচনের মধ্য দিয়ে। শিক্ষার্থীরা যখন চতুর্থ শ্রেণিতে পড়ে তখন থেকেই বিদ্যালয়গুলো এ ব্যাপারে ভাবতে শুরু করে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে চতুর্থ শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফলের ওপর ভিত্তি করেই পঞ্চম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ করা হয় ও সমাপনী পরীক্ষার্থী হিসেবে গণ্য করা হয়। যারা বার্ষিক পরীক্ষায় ভালো ফল করে না, বিদ্যালয়গুলো তাদের জন্য মা-বাবার কাছ থেকে বিদ্যালয় আয়োজিত কোচিং-এ পাঠানো ও প্রাইভেট টিউটর রাখার প্রতিজ্ঞা করিয়ে নেয়। কিছু ব্যতিক্রম বাদে, এভাবে প্রায় সব শিক্ষার্থীই প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার দিকে অগ্রসর হয়।

কোচিং ক্লাসের বাধ্যবাধকতা অনুসারে বিভিন্ন ধরনের বিদ্যালয়ের শতকরা বিন্যাস

কোচিং-এর বাধ্যবাধকতা	বিদ্যালয়ের ধরন				
	সরকারি	নতুন সরকারি	কিন্ডার-গার্টেন	উপানু-ষ্ঠানিক	এবতেদায়ি মাদ্রাসা
বাধ্যতামূলক	৭৮.০	৭৬.০	৬১.৩	৭১.২	৬২.৭
বাধ্যতামূলক নয়	৭.৩	১২.০	২৫.৫	১৫.২	১২.০
অনুষ্ঠিত হয়নি	১৪.৭	১২.০	১৩.১	১৩.৬	২৫.৩
মোট	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০

সূত্র: এডুকেশন ওয়াচ প্রধান শিক্ষকের সাক্ষাৎকার, ২০১৪

- প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার্থীদের প্রস্তুতির জন্য বিদ্যালয়গুলোর একমাত্র মাধ্যম হলো কোচিং ক্লাসের ব্যবস্থা করা। সার্বিকভাবে গত বছর ৮৬.৩ শতাংশ বিদ্যালয় কোচিং ক্লাসের আয়োজন করেছিল; ৮৬.৮ শতাংশ গ্রামীণ

ও ৮২.৪ শতাংশ শহুরে বিদ্যালয়ে এর আয়োজন করা হয়েছিল। পঁচাশি শতাংশেরও বেশি সংখ্যক সরকারি, নতুন সরকারি, কিন্ডারগার্টেন ও উপানুষ্ঠানিক বিদ্যালয়ে কোচিং ক্লাসের আয়োজন করা হয়েছিল; এবতেদায়ি মাদ্রাসার ক্ষেত্রে যা তিন-চতুর্থাংশের কম। আয়োজিত সব বিদ্যালয়েই কোচিং ক্লাস বাধ্যতামূলক ছিল না। প্রায় ১২.৮ শতাংশ বিদ্যালয়ে এটি ঐচ্ছিক ছিল– গ্রামের বিদ্যালয়গুলোর মধ্যে এই হার ১১.৪ শতাংশ ও শহরের বিদ্যালয়গুলোর মধ্যে ২২.১ শতাংশ। এক-চতুর্থাংশ কিন্ডারগার্টেন ও ৭.৩ শতাংশ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের কোচিং-এ অংশগ্রহণ করা বাধ্যতামূলক ছিল না।

- বেশিরভাগ বিদ্যালয়েই বছরের শুরু থেকে কোচিং ক্লাস চালু হয়েছিল। এটি আয়োজন করা হতো বিদ্যালয়ের কর্মঘণ্টার আগে, পরে বা মাঝখানে; কোনো কোনো বিদ্যালয়ে এর যে কোনো দুটির সমন্বয়ে। জানুয়ারি থেকে মার্চ মাসের মধ্যে কোচিং ক্লাস শুরু হয়েছিল ৮৯ শতাংশ সরকারি ও ৭৭.২ শতাংশ নতুন সরকারি বিদ্যালয়ে এবং ৬৫.৬ শতাংশ কিন্ডারগার্টেনে। অপরদিকে, ৬৮.৫ শতাংশ উপানুষ্ঠানিক বিদ্যালয় ও ৯১.৫ শতাংশ এবতেদায়ি মাদ্রাসায় কোচিং ক্লাস শুরু হয়েছিল জুন থেকে অক্টোবর মাসের মধ্যে। গড়ে বিদ্যালয়গুলো ৭.৩ মাসের জন্য কোচিং ক্লাসের আয়োজন করেছিল– গ্রামের বিদ্যালয়ে ৭.৪ মাস ও শহরের বিদ্যালয়ে ৬.৮ মাস।

- সারা বছরে বিদ্যালয়গুলো গড়ে ৪১২ ঘণ্টার কোচিং প্রদান করেছিল; গ্রামের বিদ্যালয়গুলোতে ৪১৬ ঘণ্টা ও শহরের বিদ্যালয়গুলোতে ৩৮২ ঘণ্টা। বিদ্যালয়ের ধরন অনুসারে, নতুন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এটি ৪৪০ ঘণ্টা, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৪২৩ ঘণ্টা, কিন্ডারগার্টেনে ৪১৬ ঘণ্টা, উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ২৬৬ ঘণ্টা ও এবতেদায়ি মাদ্রাসায় ২২১ ঘণ্টা।

কোচিং শুরু হওয়ার মাস অনুসারে বিদ্যালয়ের শতকরা বিন্যাস

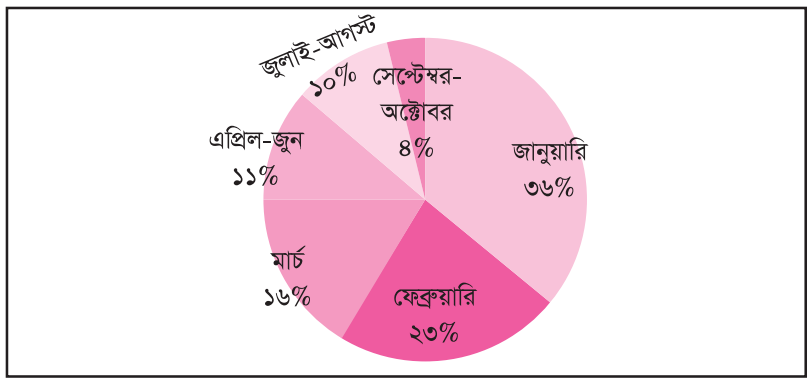

সূত্র: এডুকেশন ওয়াচ প্রধান শিক্ষকের সাক্ষাৎকার, ২০১৪

- চুয়াল্লিশ শতাংশ বিদ্যালয়ের সব শিক্ষকই কোচিং ক্লাসে পড়িয়েছেন। এটি গ্রামের ৪৭ শতাংশ ও শহরের ২৫.৬ শতাংশ বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অন্য বিদ্যালয়গুলো তাদের সবচেয়ে দক্ষ শিক্ষকদের অথবা যারা কোচিং করিয়ে বা প্রাইভেট পড়িয়ে নাম কুড়িয়েছেন তাদের এ কাজে নিয়োজিত করেছিল। এক শতাংশ বিদ্যালয় নিজস্ব কোনো শিক্ষককেই একাজে লাগায়নি কিন্তু ছয় শতাংশ বিদ্যালয় বাইরের লোকদের এ কাজে যুক্ত করেছিল। বিদ্যালয়ের বাইরে থেকে যারা যুক্ত হয়েছিলেন তারা হলেন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ভালো শিক্ষার্থী, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ও এলাকার নামকরা প্রাইভেট টিউটর। গবেষণাভুক্ত বিদ্যালয়ের পুরুষ শিক্ষকদের দুই-তৃতীয়াংশ ও নারী শিক্ষকদের অর্ধেক কোচিং ক্লাসের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন।

- মাত্র ২২.৭ শতাংশ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকরা দাবি করেছেন যে, তারা কোচিং ক্লাসের জন্য ফি নেন। গ্রামের এক-পঞ্চমাংশ ও শহরের দুই-পঞ্চমাংশের কিছু বেশি বিদ্যালয়ে কোচিং ফি নেওয়া হয়। ফি নেওয়ার দিক থেকে কিন্ডারগার্টেন সবচেয়ে এগিয়ে– ৬৪.২ শতাংশ কিন্ডারগার্টেনে ফি নেওয়া হয় আর সরকারি বিদ্যালয় সবচেয়ে পিছিয়ে– মাত্র ১০.২ শতাংশ। বিদ্যালয় আয়োজিত কোচিং-এ অংশ নেওয়ার জন্য মাসে শিক্ষার্থীপ্রতি গড়ে ২০৬ টাকা করে লেগেছে। এটি গ্রামের বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য ১৮০ টাকা আর শহরের বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য ২৯০ টাকা। বিদ্যালয়ের ধরন অনুসারে, কিন্ডারগার্টেন শিক্ষার্থীপ্রতি মাসে ফি নিয়েছে ২৭৪ টাকা, এবতেদায়ি মাদ্রাসা নিয়েছে ১৭০ টাকা, উপানুষ্ঠানিক বিদ্যালয় ১৫০ টাকা, সরকারি বিদ্যালয় ১৪০ টাকা এবং নতুন সরকারি বিদ্যালয় ৯৩ টাকা।

- প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা শুরুর পর থেকে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে আরেকটি নতুন সংযোজন হলো মডেল টেস্ট। বিদ্যালয়গুলোর নিজস্ব উদ্যোগ, কতকগুলো বিদ্যালয় একত্রিত হয়ে সমন্বিতভাবে এবং উপজেলা শিক্ষা অফিসের উদ্যোগে এই টেস্ট আয়োজিত হয়। মডেল টেস্টের উদ্দেশ্য হলো মূল পরীক্ষার জন্য পরীক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া এবং মূল পরীক্ষায় সম্ভাব্য কী ধরনের প্রশ্ন আসতে পারে তার একটা ধারণা দেওয়া।

কোচিং ফি নিচ্ছে এমন বিদ্যালয়ের শতকরা হার

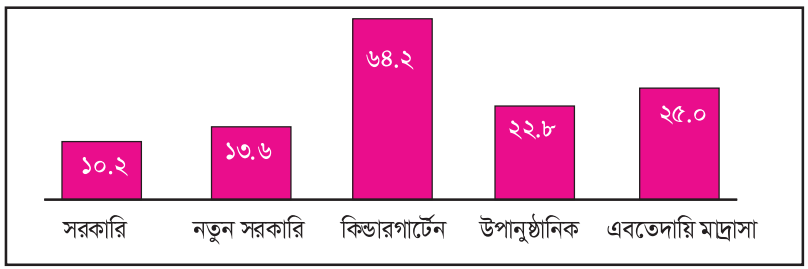

সূত্র: এডুকেশন ওয়াচ প্রধান শিক্ষকের সাক্ষাৎকার, ২০১৪

সার্বিকভাবে, ৬৩ শতাংশ বিদ্যালয় নিজ উদ্যোগে মডেল টেস্ট আয়োজন করেছিল, ৮৮.৯ শতাংশ বিদ্যালয় অন্য কর্তৃপক্ষ আয়োজিত মডেল টেস্টে অংশ নিয়েছিল। চুয়ান্ন শতাংশেরও বেশি বিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থীরা উভয় ধরনের টেস্টেই অংশ নিয়েছিল। মডেল টেস্ট নেওয়ার ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের ধরন অনুসারে কোনো পার্থক্য পাওয়া যায়নি।

- পরীক্ষার্থীদের প্রস্তুতির জন্য কোচিং ও মডেল টেস্ট নামক যে দুটি হাতিয়ার বিদ্যালয়গুলো বেছে নিয়েছিল সেগুলোও তারা যথাযথ গুরুত্বের সঙ্গে ব্যবহার করেনি। শিক্ষাদানের জন্য শিক্ষকদের মধ্যে উদ্ভাবনী প্রচেষ্টার যেমন অভাব ছিল, তেমনই দায়সারাভাবে কাজগুলো করে যাওয়ার প্রবণতাও প্রবল ছিল। একটি পিরিয়ডের দৈর্ঘ্য ৩৫-৪০ মিনিটের বদলে এক ঘণ্টা করা ছাড়া বিদ্যালয়ের প্রাত্যহিক শিক্ষাদান প্রক্রিয়া ও কোচিং-এর মধ্যে কোনো তফাৎ খুঁজে পাওয়া যায়নি। পড়ালেখার প্রধান উপকরণ ছিল বাজার থেকে কেনা গাইডবই; পাঠ্যবইয়ের ব্যবহার নেহায়েত চোখে পড়েছে। প্রাত্যহিক যেরকম করা হতো, কোচিংয়েও শিক্ষার্থীদের দলবদ্ধভাবে পাঠ দেওয়া হতো। বেশিরভাগ শিক্ষার্থীর জন্য আলাদাভাবে যত্ন পাওয়ার কোনো সুযোগ ছিল না। সমাপনী পরীক্ষায় সর্বোচ্চ ফল (গ্রেড পয়েন্ট গড় বা জিপিএ ৫) নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কোনো কোনো বিদ্যালয়ে 'ভালো' শিক্ষার্থীদের জন্য আলাদা কোচিংয়ের ব্যবস্থা করতে দেখা গেছে।

- এমনকি মডেল টেস্টেও শিক্ষার্থীরা বই ও সতীর্থদের সাহায্য নিয়ে লিখেছে এবং শিক্ষকরা এসব দিকে কোনো ভ্রুক্ষেপ করেননি। তদুপরি শিক্ষকরা মডেল টেস্টের উত্তরপত্র ঠিকভাবে দেখেননি। তাঁরা সাদামাটাভাবে উত্তরপত্র সম্পর্কে একটি সাধারণ ধারণা লাভ করে তার কিছুমাত্র সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। শিক্ষার্থীদের জন্য সমস্যা অনুসারে সমাধান পাওয়ার ব্যবস্থা ছিল খুবই নগণ্য। এসব কর্মকাণ্ড থেকে সমাপনী পরীক্ষার্থীদের প্রস্তুতিতে বিদ্যালয়গুলো যেসব ব্যবস্থা নিয়েছে তার কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠানো যায়।

৩. সমাপনী পরীক্ষার প্রস্তুতিতে শিক্ষার্থীদের পরিবারের সাড়া

বিদ্যালয়ের নেওয়া উদ্যোগগুলোতে শিক্ষার্থীদের পরিবারগুলো কী ধরনের সাড়া দিয়েছে এবং শিক্ষার্থীদের প্রস্তুতিতে পরিবারগুলো নতুন কী উদ্যোগ নিয়েছে তা এ গবেষণার একটা প্রতিপাদ্য বিষয়। এসব বিষয়ে আর্থসামাজিক পার্থক্যগুলোও অনুসন্ধান করা হয়েছে।

- সমাপনী পরীক্ষার্থীদের প্রস্তুতিতে পরিবারগুলো তিনভাবে সাড়া দিয়েছে। এগুলো হলো বিদ্যালয় আয়োজিত কোচিং-এ অংশ নিতে দেওয়া, তাদের প্রাইভেট টিউটরের ব্যবস্থা করা এবং পরিবারের সদস্যদ্বারা পড়ালেখায় সাহায্য করা। গড়ে ৮১.১ শতাংশ পরীক্ষার্থী বিদ্যালয় আয়োজিত কোচিং-এ

অংশ নিয়েছিল, ৭৭.১ শতাংশ শিক্ষার্থী প্রাইভেট টিউটরের শরণাপন্ন হয়েছিল এবং ৪৭.৪ শতাংশ শিক্ষার্থীকে পরিবারের সদস্যরা পড়িয়েছিলেন।

- বিদ্যালয় আয়োজিত কোচিং-এ অংশ নেওয়া কিংবা প্রাইভেট টিউটরের কাছে পড়ার ক্ষেত্রে ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে কোনো তফাৎ পাওয়া যায়নি; যদিও পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে ছেলেরা মেয়েদের তুলনায় বেশি সাহায্য পেয়েছিল (৪৯.৯ শতাংশ ও ৪৫ শতাংশ; $p<0.001$)। গ্রামীণ বিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থীরা শহরের বিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থীদের তুলনায় অধিক হারে বিদ্যালয় আয়োজিত কোচিং-এ অংশ নিয়েছিল (৮৩ শতাংশ ও ৭০.৬ শতাংশ; $p<0.001$) কিন্তু অন্য দুই ক্ষেত্রে এর বিপরীত চিত্র পাওয়া গেছে। শহরের ৮২ শতাংশ ও গ্রামের ৭৬.২ শতাংশ পরীক্ষার্থীর প্রাইভেট টিউটর ছিল ($p<0.001$) এবং শহরের ৫৪.৩ শতাংশ ও গ্রামের ৪৬.১ শতাংশ পরীক্ষার্থী পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে পড়ালেখায় সহায়তা পেয়েছিল ($p<0.001$)।

বিবিধ প্রকার পাঠ নেওয়া পরীক্ষার্থীদের এলাকাভেদে শতকরা হার

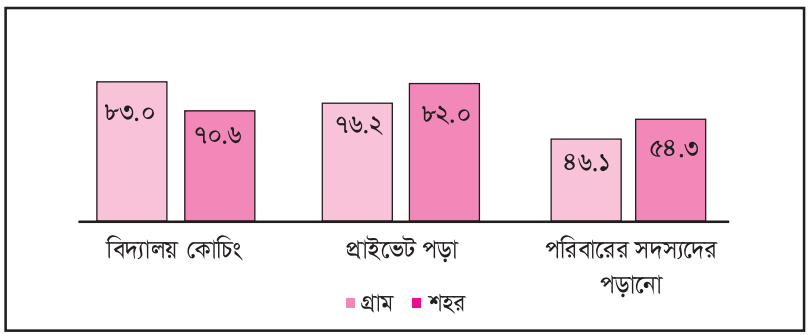

সূত্র: এডুকেশন ওয়াচ প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার্থী জরিপ, ২০১৪

- উপর্যুক্ত তিনটি ক্ষেত্রেই বিদ্যালয়ের ধরন অনুসারে পার্থক্য পাওয়া গেছে। বিদ্যালয় আয়োজিত কোচিং-এ অংশ নেওয়া ও পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে সহায়তা পাওয়ার ক্ষেত্রে কিন্ডারগার্টেনের পরীক্ষার্থীরা অন্য সবার চেয়ে এগিয়ে ছিল (যথাক্রমে ৯৩.৩ ও ৬৪.১ শতাংশ); আর প্রাইভেট টিউটরের সহায়তা নেওয়ার ক্ষেত্রে এগিয়ে ছিল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থীরা (৮০.৩ শতাংশ)। অন্যদিকে, প্রাইভেট টিউটরের সহায়তা নেওয়া ও পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে সহায়তা পাওয়ার ক্ষেত্রে সবচেয়ে পিছিয়ে ছিল উপানুষ্ঠানিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা (যথাক্রমে ৫১.১ ও ৩৮.৯ শতাংশ), কিন্তু এবতেদায়ি মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা পিছিয়ে ছিল বিদ্যালয় আয়োজিত কোচিং-এ অংশ নেওয়ার ক্ষেত্রে (৬৪.১ শতাংশ)।

বিদ্যালয়ের ধরন অনুসারে বিবিধ প্রকার টিউটরিং গ্রহণকারী পরীক্ষার্থীদের শতকরা হার

টিউটরিং-এর প্রকার	বিদ্যালয়ের ধরন				
	সরকারি	নতুন সরকারি	কিন্ডার-গার্টেন	উপানু-ষ্ঠানিক	এবতেদায়ি মাদ্রাসা
বিদ্যালয় কোচিং	৭৯.৮	৮১.৩	৯৩.২	৭৪.২	৬৪.১
প্রাইভেট পড়া	৮০.৩	৭৮.৫	৬৮.৮	৫১.১	৫৬.৮
পরিবারের সদস্যদের পড়ানো	৪৬.১	৪৫.৭	৬৪.২	৩৮.৯	৪২.৬

সূত্র: এডুকেশন ওয়াচ প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার্থী জরিপ, ২০১৪

- যে শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয় আয়োজিত কোচিং-এ অংশ নিয়েছিল তাদের অর্ধেক তা বিনামূল্যে পেয়েছিল। যেসব পরীক্ষার্থী বিদ্যালয়ের কোচিং বিনামূল্যে পেয়েছিল, যারা ফি-এর বিনিময়ে পেয়েছিল এবং যারা কোনো স্কুল কোচিং নেয়নি প্রত্যেক অংশেরই বেশিরভাগ পরীক্ষার্থী অর্থের বিনিময়ে প্রাইভেট টিউটরের কাছে পড়েছিল। যারা বিনামূল্যে বিদ্যালয় আয়োজিত কোচিং-এ অংশ নিয়েছিল তাদের ৮৩ শতাংশ, যারা বিদ্যালয় আয়োজিত কোচিং-এর জন্য ফি দিয়েছিল তাদের ৬৯ শতাংশ এবং যারা বিদ্যালয় আয়োজিত কোচিং নেয়নি তাদের ৮২ শতাংশ প্রাইভেট টিউটরের দ্বারস্ত হয়েছিল। সংজ্ঞানুসারে, প্রাইভেট পড়া সবসময়ই অর্থের বিনিময়ে হয়ে থাকে।

- মোট পরীক্ষার্থীদের এক-তৃতীয়াংশ বিদ্যালয়ের কোচিং-এ অংশ নেওয়ার পাশাপাশি প্রাইভেট টিউটরের কাছেও পড়েছিল; আরও ২৮.৮ শতাংশ পরীক্ষার্থী এদুটোতে অংশ নেওয়ার পাশাপাশি পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে সহায়তা পেয়েছিল। বিদ্যালয় আয়োজিত কোচিং-এ অংশ নেওয়ার পাশাপাশি পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে সহায়তা পেয়েছিল ১১.৭ শতাংশ পরীক্ষার্থী। প্রাইভেট টিউটর ও পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে সহায়তা নিয়েছিল ৫.৭ শতাংশ শিক্ষার্থী। অন্যদের মধ্যে ৯.৮ শতাংশ পরীক্ষার্থী কেবল প্রাইভেট টিউটরের সহায়তা নিয়েছিল, ৭.৮ শতাংশ পরীক্ষার্থী শুধু বিদ্যালয় আয়োজিত কোচিং-এ অংশ নিয়েছিল, ১.২ শতাংশ পরীক্ষার্থী শুধু পরিবারের সদস্যদের সহায়তা নিয়েছিল এবং ২.১ শতাংশ পরীক্ষার্থী কোনো সহায়তাই নেয়নি।

- কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত নন (অর্থাৎ পেশায় শিক্ষক নন) কিন্তু প্রাইভেট পড়ান– এরাই প্রাইভেট টিউটরদের সবচেয়ে বড় অংশ (৪০.৩ শতাংশ)। এদের মধ্যে রয়েছেন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, শিক্ষিত চাকরিপ্রার্থী, চাকরিরত ব্যক্তি ও অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক। প্রাইভেট টিউটর

হিসেবে এদের প্রায় সমান পরিমাণে রয়েছেন পরীক্ষার্থীদের নিজ বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা (৩৯.৮ শতাংশ)। অন্য বিদ্যালয়ের শিক্ষক, কোচিং সেন্টার, আত্মীয় ও প্রতিবেশীরা প্রাইভেট পড়িয়েছেন যথাক্রমে ১৪.৬, ১২.১, ২.৯ ও ৪.৬ শতাংশ পরীক্ষার্থীকে। মা, বোন, ভাই, আত্মীয় ও বাবা বাড়িতে পড়িয়েছেন যথাক্রমে ৩৭.৭, ২৪.৯, ২০.৪, ১৫.৭ ও ১২.৩ শতাংশ পরীক্ষার্থীকে। বাড়িতে পড়ানোর ক্ষেত্রে শহর এলাকার মা-বাবারা গ্রামীণ এলাকার মা-বাবার তুলনায় এগিয়ে ছিলেন। অন্যদিকে, ভাই, বোন ও আত্মীয়রা এগিয়ে ছিলেন গ্রামীণ এলাকায়।

- উপর্যুক্ত তিনটি উৎস থেকে সম্মিলিতভাবে সমাপনী পরীক্ষার্থীরা সারা বছরে গড়ে ৭৫৪ ঘণ্টার পাঠ নিয়েছিল। যদিও এ ক্ষেত্রে ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে কোনো তফাৎ পাওয়া যায়নি, শহর এলাকার পরীক্ষার্থীরা গ্রামীণ এলাকার পরীক্ষার্থীদের তুলনায় বেশি সময় ধরে পাঠ নিয়েছিল (যথাক্রমে ৭৭৫ ও ৭৪৯ ঘণ্টা; $p<0.001$)। বিদ্যালয়ের ধরন অনুসারে, সবচেয়ে বেশি সময়ের জন্য পাঠ নিয়েছিল কিন্ডারগার্টেনের পরীক্ষার্থীরা (৯১০ ঘণ্টা) এবং সবচেয়ে কম পাঠ নিয়েছিল উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থীরা (৩৭৪ ঘণ্টা)। অন্যদের মধ্যে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থীরা ৭৮৩ ঘণ্টার, নতুন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থীরা ৭০৫ ঘণ্টার এবং এবতেদায়ি মাদ্রাসার পরীক্ষার্থীরা ৩৮১ ঘণ্টার পাঠ নিয়েছিল।

বিদ্যালয়ের ধরন অনুসারে তিনটি উৎস থেকে পরীক্ষার্থীপ্রতি গড় পাঠের ঘণ্টা

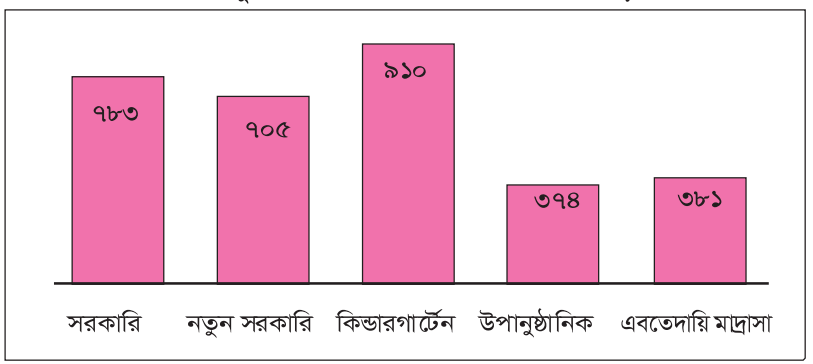

সূত্র: এডুকেশন ওয়াচ প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার্থী জরিপ, ২০১৪

- মোট পাঠ সময়ের ৫৩.২ শতাংশ ব্যবহৃত হয়েছিল বিদ্যালয় আয়োজিত কোচিং-এ, ৪১ শতাংশ ব্যবহৃত হয়েছিল প্রাইভেট পড়তে এবং ৫.৮ শতাংশ ব্যবহৃত হয়েছিল পরিবারের সদস্যদের কাছে পড়তে। সময়ের এই বিন্যাসটি ছেলে ও মেয়েদের ক্ষেত্রে একই ধরনের পাওয়া গেছে। যদিও গ্রামীণ এলাকার পরীক্ষার্থীরা বিদ্যালয় আয়োজিত কোচিং-এর জন্য ৫৫.৮ শতাংশ

ও প্রাইভেট পড়ার জন্য ৩৮.৬ শতাংশ সময় ব্যয় করেছিল, শহর এলাকার পরীক্ষার্থীরা ৪০.৩ শতাংশ সময় ব্যয় করেছিল বিদ্যালয় আয়োজিত কোচিং-এর জন্য ও ৫৩.৭ শতাংশ সময় ব্যয় করেছিল প্রাইভেট পড়তে। সব ধরনের বিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থীরাই প্রাইভেট পড়ার তুলনায় বিদ্যালয় আয়োজিত কোচিং-এর জন্য বেশি সময় ব্যয় করেছিল। কিন্ডারগার্টেনের পরীক্ষার্থীরা এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম– তারা বিদ্যালয় আয়োজিত কোচিং-এ প্রাইভেট পড়ার দ্বিগুণ সময় ব্যয় করেছিল।

পাঠের ধরন অনুসারে মোট পাঠ সময়ের শতকরা বিন্যাস

পরীক্ষার্থী দল	পাঠের প্রকার			মোট
	বিদ্যালয়ের কোচিং	পরিবারের সদস্য	প্রাইভেট পড়া	
সব	৫৩.২	৫.৮	৪১.০	১০০.০
ছেলে	৫৩.৫	৬.০	৪০.৫	১০০.০
মেয়ে	৫৩.১	৫.৬	৪১.৩	১০০.০
গ্রামীণ	৫৫.৮	৫.৭	৩৮.৬	১০০.০
শহুরে	৪০.৩	৬.১	৫৩.৭	১০০.০
সরকারি	৫১.১	৫.৬	৪৩.৩	১০০.০
নতুন সরকারি	৫৩.৮	৫.৭	৪০.৫	১০০.০
কিন্ডারগার্টেন	৬২.৯	৬.৭	৩০.৪	১০০.০
উপানুষ্ঠানিক	৫৭.৫	৭.২	৩৫.৩	১০০.০
এবতেদায়ি মাদ্রাসা	৪৭.৫	১০.০	৪২.৫	১০০.০

সূত্র: এডুকেশন ওয়াচ প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার্থী জরিপ, ২০১৪

- পরীক্ষার্থীদের আর্থসামাজিক পটভূমির নিরিখে নানা উৎসের পাঠে ব্যয়িত সময়ের কোনো সরলরৈখিক সম্পর্ক পাওয়া যায়নি। অবশ্য যেসব পরীক্ষার্থীর মা-বাবা মাধ্যমিক বা তার বেশি পড়ালেখা করেছেন এবং যারা অর্থনৈতিকভাবে উদ্বৃত্ত খানার অধিবাসী তারা অন্যদের তুলনায় বেশি সময়ের জন্য উপর্যুক্ত তিন উৎস থেকে পাঠ নিয়েছিল।

৪. প্রাথমিক শিক্ষাসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের চোখে সমাপনী পরীক্ষা

প্রাথমিক শিক্ষাসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে রয়েছেন পরীক্ষার্থী ও তাদের মা-বাবা, শিক্ষক ও পরীক্ষকরা এবং পরীক্ষাসংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ। তাঁরা নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকে সমাপনী পরীক্ষা সম্পর্কে এক ধরনের মিশ্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন।

- প্রথম বারের মতো এক বিশেষ ধরনের পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে বলে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা শিক্ষার্থী ও তাদের মা-বাবার ভেতর এক ধরনের গর্ব ও তৃপ্তি এনে দিয়েছে। এই পরীক্ষার কারণে তারা ও তাদের বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা পড়ালেখার ব্যাপারে আগের তুলনায় নিষ্ঠাবান হয়েছেন। এই পরীক্ষা শিক্ষার্থীদের পরীক্ষাভীতি দূর করেছে। পাঁচ বছরের প্রাথমিক শিক্ষা শেষে পরীক্ষার মাধ্যমে অর্জিত সনদপত্র প্রাপ্তি প্রায় প্রত্যেকেই ছোট শিক্ষার্থীদের জন্য অনুপ্রেরণা হিসেবে দেখেছেন।

- শিক্ষাসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের ওপর বিভিন্ন ধরনের চাপ লক্ষ করেছেন যা তাদের মতে সমাপনী পরীক্ষা থেকেই উদ্ভূত। যে কারণে শিক্ষার্থীদের ওপর চাপ পড়ছে বলে তারা মনে করেছেন তা হলো, শিক্ষাক্রমের অতিরিক্ত চাহিদা, বিদ্যালয় আয়োজিত কোচিং ও প্রাইভেট পড়ার আধিক্য, বিদ্যালয়ে নানা ধরনের প্রস্তুতিমূলক পরীক্ষা এবং মা-বাবার পক্ষ থেকে ফলাফল সম্পর্কে অতিরিক্ত প্রত্যাশা।

- পরীক্ষার্থীদের গাইডবই ও সাজেসন্সের ওপর ক্রমবর্ধমান নির্ভরশীলতা এবং সৃজনশীলভাবে শেখার পরিবর্তে মুখস্ত করার প্রবণতাকে শিক্ষাসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ব্যাপক সমালোচনা করেছেন। তাঁরা অভিযোগের সুরে বলেছেন যে, পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের কোনো অবসর নেই; অন্যদিকে, অন্যান্য শ্রেণির শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের সান্নিধ্য পাওয়া থেকে প্রায়শই বঞ্চিত হচ্ছে। শিক্ষকরা তাদের কাজের পরিমাণ বাড়ার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করাতে চেয়েছেন।

- প্রাথমিক শিক্ষার সার্বিক মান, সমাপনী পরীক্ষার মূল্যায়ন পদ্ধতি এবং শিক্ষক ও বিদ্যালয়ের জবাবদিহিতার প্রশ্নে এক ধরনের মিশ্র প্রতিক্রিয়া পাওয়া গেছে। এই পরীক্ষার মাধ্যমে কিন্ডারগার্টেন ও উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কর্মকাণ্ডের স্বীকৃতি দেওয়ার যে ব্যবস্থা হয়েছে অনেকেই তার প্রশংসা করেছেন।

- ব্যক্তিখাতে শিক্ষাব্যয় বৃদ্ধি পাওয়া এবং বিশেষত সমাপনী পরীক্ষার কারণে প্রাইভেট পড়ার ক্রমবর্ধমান প্রবণতায় শিক্ষাসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের অনেকেই তাদের উদ্বেগের কথা জানিয়েছেন। শিক্ষাক্ষেত্রে সমতা বিধানের নীতি ও শিক্ষার অধিকারের কথা তুলে তারা এ বিষয়গুলোর খারাপ প্রভাব নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন।

৫. পরীক্ষাসম্পর্কে গণমাধ্যমে প্রতিবেদন

সমাপনী পরীক্ষার সময় জাতীয় ও স্থানীয় দৈনিকগুলো নানা ধরনের প্রতিবেদন প্রকাশ করে। এর মধ্যে রয়েছে খবর, সম্পাদকীয়, উপসম্পাদকীয়, বিশেষজ্ঞ মতামত ইত্যাদি। পাঁচটি জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত উপর্যুক্ত বিষয়াদি নিয়ে এ অংশ তৈরি করা হয়েছে।

- ২০১৪ সালে পরীক্ষা অনুষ্ঠানের সপ্তাহে প্রশ্নপত্র ফাঁসের খবরই ছিল পত্রিকাগুলোতে সবচেয়ে আলোচিত সংবাদ। খবরগুলোর সারমর্ম হলো এই যে, পরীক্ষার ছয়টি বিষয়ের প্রতিটির প্রশ্নপত্রই দেশের কোনো না কোনো অঞ্চল থেকে ফাঁস হয়েছে। ফাঁস হওয়া প্রশ্নপত্র দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে ফেইসবুক ও ইমেইলকে বাহন হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। তাছাড়াও এ ব্যাপারে কোচিং সেন্টারের ভূমিকার কথাও পত্রিকাগুলোতে এসেছে।

- এই অপতৎপরতার সঙ্গে জড়িতদের পাকড়াও করতে ভ্রাম্যমান আদালত ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কর্মতৎপরতার কথাও পত্রিকাগুলোতে এসেছে। পত্রিকার প্রতিবেদকরা দেখেছেন যে, পরীক্ষার হলে শিক্ষকরা পরীক্ষার্থীদের উত্তরপত্রে লিখে দিচ্ছেন এবং ভুয়া পরীক্ষার্থী বসে পরীক্ষা দিচ্ছে। বেশ কয়েকজন শিক্ষক, ভুয়া পরীক্ষার্থী ও কোচিং সেন্টারের লোকজনকে ধরা হয়েছে, জেলে পাঠানো হয়েছে ও জরিমানা করা হয়েছে।

- বেশ কটি প্রতিবেদনে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি ও বাংলাদেশ সরকারের প্রেসের (বিজি প্রেস) দায়িত্ব ও কর্তব্য নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে। বেশিরভাগ প্রতিবেদনেই প্রশ্নপত্র ফাঁসের জন্য উপর্যুক্ত কর্তৃপক্ষগুলোকে দোষারোপ করা হয়েছে এবং এ ধরনের একটি পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার ক্ষেত্রে তাদের দক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে।

- গণমাধ্যম লক্ষ করেছে যে, মাননীয় মন্ত্রীরাসহ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা সমস্বরে প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ পুরোপুরি অস্বীকার করেছেন। তাঁরা পত্রিকায় প্রকাশিত খবরগুলোকে অসত্য, ভিত্তিহীন, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত, সন্দেহজনক, বিভ্রান্তিকর, গুজব ইত্যাদি বলে অভিহিত করেন। এক ধরনের আইনি অবস্থান থেকে মন্ত্রণালয়গুলো দাবি করে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত না জেলা পর্যায়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের কাছ থেকে লিখিত অভিযোগ আসে ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁরা কোনো প্রকার প্রতিক্রিয়ায় যেতে পারেন না। তাদের কেউ কেউ অবশেষে বলেন, পরীক্ষার আগে যে প্রশ্নগুলো বেরিয়ে এসেছে তা আসলে অভিজ্ঞ শিক্ষকদের দেওয়া সাজেসন্স এবং দৈবভাবে এগুলো মূল পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের সঙ্গে মিলে গেছে। দেখে মনে হচ্ছে, পত্রিকায় প্রকাশিত যে খবরগুলো পঞ্চম শ্রেণির শেষে জাতীয়ভিত্তিক সর্বজনীন পরীক্ষাগ্রহণের সরকারি সিদ্ধান্তের প্রতি অনাস্থা জাগাতে পারে সেগুলো স্বীকার না করতে সরকারি পর্যায়ে একটা অবস্থান নেওয়া হয়েছে।

- খবরের কাগজগুলো এ ব্যাপারে সম্পাদকীয় ও উপসম্পাদকীয় প্রকাশ করে সর্বজনীন পরীক্ষার পবিত্রতা রক্ষার আহ্বান জানায়। এসব লেখায় প্রশ্নপত্র প্রকাশসহ পরীক্ষাসংক্রান্ত নানা কাজে অসদুপায় অবলম্বনের সঙ্গে যারা জড়িত তাদের খুঁজে বের করে আইনের আওতায় আনার জন্য সরকারকে পরামর্শ দেওয়া হয়। সংবাদপত্রগুলো অভিমত দেয় যে, প্রশ্নপত্র তৈরি ও পরীক্ষাগ্রহণ

প্রক্রিয়ার অপব্যবহার জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থায় সর্বনাশ ডেকে আনছে এবং সততা ও ন্যায়পরায়ণতা সম্পর্কে শিশুদের ভুল বার্তা দিচ্ছে।

- সমাপনী পরীক্ষা শুরুর দিন ও ফলাফল প্রকাশের পরদিন সংবাদপত্রগুলো গুরুত্বসহকারে এ সংক্রান্ত খবর পরিবেশন করে। পত্রিকাগুলো ফলাফলের নানা ধরনের বিশ্লেষণও ছাপে। পত্রিকাগুলো সেরা বিদ্যালয়, সবচেয়ে ভালো ফল অর্জনকারী শিক্ষার্থী, ফলাফলে গ্রাম-শহরের বিভাজনসম্পর্কে প্রতিবেদন ছাপা হয় এবং ভালো ফলাফল অর্জনকারীদের উৎফুল্ল ছবিও প্রকাশ করে।
- ছয় বছর আগে সমাপনী পরীক্ষা শুরুর সময় পত্রিকাগুলো শিশুদের ক্ষেত্রে সর্বজনীন পরীক্ষার প্রভাব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছিল। প্রকাশ করেছিল শিক্ষাবিদদের অভিমত। দেখা গেছে, এই পরীক্ষার মাহাত্ম্য প্রচারিত হতে থাকলে আস্তে আস্তে এই প্রশ্নগুলো স্তিমিত হয়ে যায়। প্রশ্নপত্র ফাঁসসহ অন্যান্য অপতৎপরতার প্রণোদনা ও কারণ নিহিত রয়েছে একে অধিক গুরুত্ব প্রদানের মধ্যে যা আবার বেআইনি কর্মকাণ্ডে যুক্ত হতে সংশ্লিষ্টদের বেপরোয়া করে তুলেছে। পরীক্ষাসম্পর্কে এ ধরনের বিশ্লেষণ পত্রিকাগুলোতে অবহেলার শিকার হয়েছে।

৬. সমাপনী পরীক্ষার ফলাফল ও এর সঙ্গে প্রান্তিক যোগ্যতা অর্জনের সম্পর্ক

সমাপনী পরীক্ষা ২০১৪-এ শিক্ষার্থীদের সার্বিক অর্জন এবং জেন্ডার, এলাকা, বিদ্যালয়ের ধরন ও আর্থসামাজিক পটভূমির পরিপ্রেক্ষিতে ফলাফলের পার্থক্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সমাপনী পরীক্ষায় শিক্ষার্থীদের অর্জনের সঙ্গে প্রান্তিক যোগ্যতা অর্জনের সম্পর্কও দেখা হয়েছে।

- সার্বিকভাবে, ১০.৬ শতাংশ পরীক্ষার্থী সর্বোচ্চ গ্রেড পয়েন্ট গড় বা জিপিএ ৫ পেয়েছে, ৪৩.৩ শতাংশ পরীক্ষার্থী জিপিএ ৪ বা তার বেশি পেয়েছে, ৭৫.৫ শতাংশ পরীক্ষার্থী জিপিএ ৩ বা তার বেশি পেয়েছে, ৯৩.৫ শতাংশ পরীক্ষার্থী জিপিএ ২ বা তার বেশি পেয়েছে এবং ৯৯.১ শতাংশ পরীক্ষার্থী জিপিএ ১ বা তার বেশি পেয়েছে। প্রায় এক-তৃতীয়াংশ পরীক্ষার্থীর জিপিএ ছিল ৪ থেকে ৫ এর মধ্যে, আরেক তৃতীয়াংশের জিপিএ ছিল ৩ থেকে ৪ এর মধ্যে– এই দুই-এ মিলে মোট ৬৪.৮ শতাংশ পরীক্ষার্থী।
- শুধু পাশের হারের (জিপিএ ১ বা তার বেশি) নিরিখে সমাপনী পরীক্ষার ফলাফলে জেন্ডার, এলাকা ও বিদ্যালয়ের ধরন অনুসারে কোনো পার্থক্য পাওয়া যায়নি কারণ প্রায় সব পরীক্ষার্থীই পাশ করেছে। মাপকাঠি যত কঠিন হতে থাকে, ততই পার্থক্যও দৃষ্টিগোচর হতে থাকে। যেমন, জিপিএ ৫, ৪+, বা ৩+ অর্জনের ক্ষেত্রে মেয়েরা ছেলেদের তুলনায় এগিয়ে ছিল এবং শহরের পরীক্ষার্থীরা গ্রামের পরীক্ষার্থীদের তুলনায় ভালো করেছে। মাপকাঠি হিসেবে জিপিএ ২+কে গ্রহণ করলে পার্থক্য কমে যায় আর জিপিএ ১+কে গ্রহণ

করলে কোনো পার্থক্য থাকে না। বিদ্যালয়ের ধরন অনুসারেও একই ধরনের ফলাফল পাওয়া গেছে। সার্বিকভাবে, কিন্ডারগার্টেন সবচেয়ে ভালো করেছে তারপরই উপানুষ্ঠানিক বিদ্যালয়ের স্থান। ধারাবাহিকভাবে রয়েছে যথাক্রমে সরকারি বিদ্যালয়, এবতেদায়ি মাদ্রাসা ও নতুন সরকারি বিদ্যালয়।

জিপিএ প্রাপ্তি, জেন্ডার ও এলাকা অনুসারে পরীক্ষার্থীদের পুঞ্জীভূত শতকরা বিন্যাস

জিপিএ	জেন্ডার		এলাকা		সব
	ছেলে	মেয়ে	গ্রাম	শহর	
৫	৯.৫	১১.৭	৮.১	২৩.৩	১০.৬
৪+	৪১.৮	৪৪.৬	৩৯.০	৬৪.৯	৪৩.৩
৩+	৭১.৫	৭৯.৪	৭৩.১	৮৭.৩	৭৫.৫
২+	৯২.৪	৯৪.৬	৯২.৭	৯৭.৪	৯৩.৫
১+	৯৮.৮	৯৯.৪	৯৯.০	৯৯.৫	৯৯.১
০+	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০

সূত্র: এডুকেশন ওয়াচ প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার্থী জরিপ, ২০১৪

জিপিএ প্রাপ্তি অনুসারে পরীক্ষার্থীদের পুঞ্জীভূত শতকরা হার

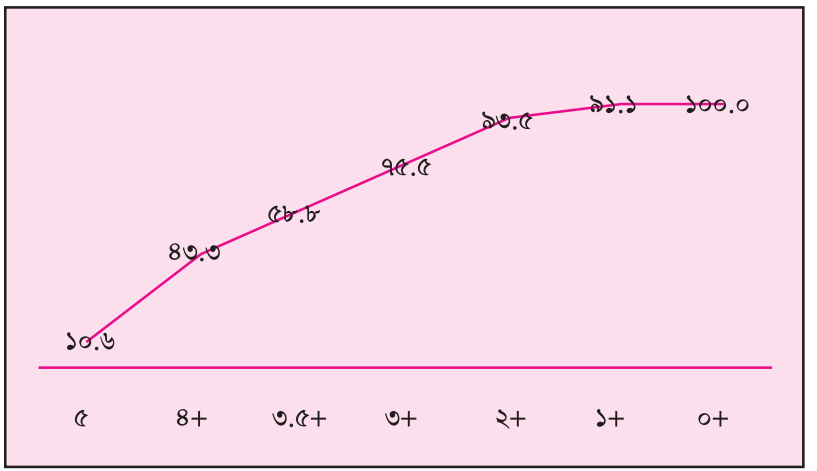

সূত্র: এডুকেশন ওয়াচ প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার্থী জরিপ, ২০১৪

জিপিএ প্রাপ্তি ও বিদ্যালয়ের ধরন অনুসারে পরীক্ষার্থীদের পুঞ্জীভূত শতকরা বিন্যাস

জিপিএ	বিদ্যালয়ের ধরন				
	সরকারি	নতুন সরকারি	কিন্ডার-গার্টেন	উপানু-ষ্ঠানিক	এবতেদায়ি মাদ্রাসা
৫	৯.১	৩.০	৪০.৬	৪.১	০.৭
৪+	৪৪.০	২২.৮	৮৪.৮	৪৯.২	২০.১
৩+	৭৭.০	৬০.৯	৯৭.০	৮৩.০	৬৫.৪
২+	৯৫.১	৮৬.৪	৯৮.৮	৯৭.২	৮৯.৯
১+	৯৯.৬	৯৭.৯	৯৯.৬	৯৯.২	৯৫.৫
০+	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০

সূত্র: এডুকেশন ওয়াচ প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার্থী জরিপ, ২০১৪

বিদ্যালয়ের ধরন অনুসারে জিপিএ ৩.৫ বা তার বেশি পেয়েছে এমন শিক্ষার্থীদের শতকরা হার

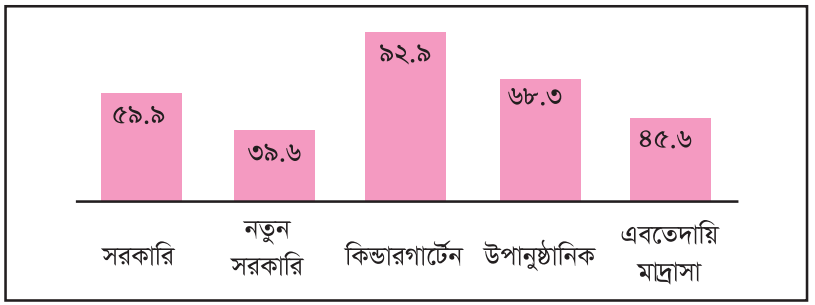

সূত্র: এডুকেশন ওয়াচ প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার্থী জরিপ, ২০১৪

- সার্বিকভাবে, ভাষার ক্ষেত্রে (বাংলা ও ইংরেজি উভয়ই) পরীক্ষার্থীরা উল্লেখযোগ্যরকম খারাপ ফল করেছে। ইংরেজিতে ৪২.৮ শতাংশ পরীক্ষার্থী লেটার গ্রেড সি অথবা ডি পেয়েছে। মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরাও আরবিতে খুব খারাপ ফল করেছে। ইংরেজি বাদে আর সব বিষয়েই সর্বোচ্চ সংখ্যক পরীক্ষার্থী সর্বোচ্চ লেটার গ্রেড পেয়েছে (এ+ বা গ্রেড পয়েন্ট ৫)। আলাদাভাবে, বাংলায় ২৭.৯ শতাংশ পরীক্ষার্থী, গণিতে ৪১ শতাংশ পরীক্ষার্থী, বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়ে ৩৫.৫ শতাংশ পরীক্ষার্থী, প্রাথমিক বিজ্ঞানে ৩৮.৮ শতাংশ পরীক্ষার্থী এবং ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষায় ৫৭.৪ শতাংশ পরীক্ষার্থী এ+ পেয়েছে। মাদ্রাসার পরীক্ষার্থীরা তাজবিদ ও আকাঈদ ফিক্কাহ্'য় ইংরেজির তুলনায় ভালো করেছে কিন্তু বাংলার তুলনায় খারাপ করেছে।

- পরীক্ষার্থীদের আর্থসামাজিক পটভূমি সমাপনী পরীক্ষার ফলাফলে শক্ত ভূমিকা রেখেছে। সমাপনী পরীক্ষার ফলাফলকে ব্যাখ্যা করার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সূচক হিসেবে বেরিয়ে এসেছে শিক্ষার জন্য ব্যক্তিখাতে ব্যয়; তারপরই রয়েছে যথাক্রমে বিদ্যালয়ের ধরন, পিতার শিক্ষা, প্রাইভেট পড়ার সময় (ঘণ্টায়), জেন্ডার, এলাকা, বিদ্যালয় আয়োজিত কোচিং-এর সময় (ঘণ্টায়) এবং পরিবারের সদস্যদের সাহায্যে পড়ার সময় (ঘণ্টায়)।

- যে পরীক্ষার্থীর শিক্ষার জন্য যত বেশি অর্থব্যয় করা হয়েছে এবং যার বাবা যত বেশি পড়ালেখা করেছে সে সমাপনী পরীক্ষায় তত ভালো করেছে। আবার, মেয়েরা ছেলেদের তুলনায় এবং শহরের শিক্ষার্থীরা গ্রামের শিক্ষার্থীদের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে ভালো ফল করেছে।

- যে পরীক্ষার্থী যত বেশি ঘণ্টা প্রাইভেট টিউটরের কাছে পড়েছে তার সমাপনী পরীক্ষার ফলাফল তত বেশি ভালো হয়েছে। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, প্রাইভেট পড়ার সময়ের নিরিখে (ঘণ্টার হিসাবে) পরীক্ষার্থীদের ঊর্ধ্বক্রমে সাজালে প্রথম তিন-চতুর্থাংশ পরীক্ষার্থীর ফলাফলে তেমন কোনো পার্থক্য পাওয়া যায়নি কিন্তু এদের তুলনায় চতুর্থ–চতুর্থাংশের পরীক্ষার্থীরা উল্লেখযোগ্যভাবে ভালো ফল করেছে। পরিবারের সদস্যদের কাছে যারা পড়ালেখা করেছে তাদের তুলনায় যারা করেনি তারা সমাপনী পরীক্ষায় ভালো ফল করেছে।

- সমাপনী পরীক্ষার ফলাফল ও *এডুকেশন ওয়াচ* প্রবর্তিত প্রান্তিক যোগ্যতাভিত্তিক পরীক্ষার ফলাফলে মধ্যম মানের যোগবোধক সম্পর্ক পাওয়া গেছে (সম্পর্কাঙ্ক ০.৬০)। আবার, পরীক্ষার্থীদের গড় যোগ্যতা অর্জন সমাপনী পরীক্ষার জিপিএ বাড়ার সাথে উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে।

প্রাপ্ত জিপিএ অনুসারে পরীক্ষার্থীদের গড় প্রান্তিক যোগ্যতা অর্জন

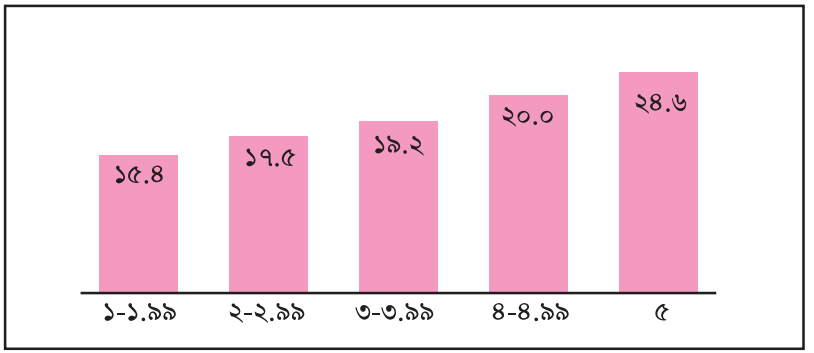

সূত্র: এডুকেশন ওয়াচ প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার্থী জরিপ, ২০১৪

৭. ব্যক্তিখাতে শিক্ষা ও অতিরিক্ত পাঠের ব্যয়

বাংলাদেশের অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় ব্যক্তিখাতে শিক্ষাব্যয় একটি চলমান ঘটনা। ব্যক্তিখাতের সার্বিক শিক্ষাব্যয়ের সঙ্গে এই অংশে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষাসংক্রান্ত ব্যয়ও আলাদা করে আলোচনা করা হয়েছে। এসব ক্ষেত্রে সময়ের সাথে পরিবর্তনও দেখা হয়েছে।

- গড়ে সারা বছরে পঞ্চম শ্রেণির একজন পরীক্ষার্থীর ব্যক্তিখাতে শিক্ষাব্যয় ছিল ৮,২১২ টাকা– সর্বনিম্ন ৫০ টাকা ও সর্বোচ্চ ৭৭,৪৫০ টাকা। এ ক্ষেত্রে যদিও ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে কোনো পার্থক্য পাওয়া যায়নি কিন্তু শহরের পরীক্ষার্থীদের জন্য গ্রামের পরীক্ষার্থীদের তুলনায় উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বেশি খরচ হয়েছিল। গ্রামের একজন পরীক্ষার্থীর জন্য গড়ে যে পরিমাণ টাকা খরচ হয়েছিল শহরের একজন পরীক্ষার্থীর জন্য খরচ হয়েছিল তার ১.৬৮ গুণ।
- ব্যক্তিখাতে শিক্ষাব্যয়ের ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের ধরন অনুসারে পার্থক্য লক্ষ করা গেছে। কিন্ডারগার্টেনের পরীক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে শিক্ষাব্যয় সবচেয়ে বেশি এবং উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে সবচেয়ে কম। দ্বিতীয়টির তুলনায় প্রথমটি ছয় গুণেরও বেশি। কিন্ডারগার্টেন পরীক্ষার্থীদের গড় বাৎসরিক খরচ নতুন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থীদের গড় বাৎসরিক খরচের তিন গুণেরও বেশি আর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থীদের খরচের ২.৪৩ গুণ। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থীদের গড় খরচ উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থীদের গড় খরচের ২.৪৮ গুণ।

বিদ্যালয়ের ধরন অনুসারে পরীক্ষার্থীপ্রতি ব্যক্তিখাতে গড় বাৎসরিক শিক্ষাব্যয় (টাকা)

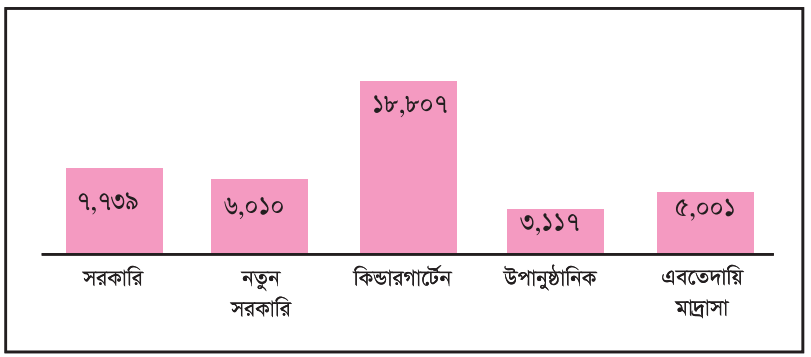

সূত্র: এডুকেশন ওয়াচ প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার্থী জরিপ, ২০১৪

- সরকারি ও নতুন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং কিন্ডারগার্টেনের শহর এলাকার পরীক্ষার্থীদের ব্যক্তিখাতে শিক্ষাব্যয় একই ধরনের বিদ্যালয়ের গ্রামীণ এলাকার পরীক্ষার্থীদের শিক্ষাব্যয়ের তুলনায় বেশি। উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে এ বিষয়ে গ্রাম ও শহরের মধ্যে কোনো তফাৎ পাওয়া যায়নি।
- প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার সঙ্গে সম্পর্কিত খাতে পরীক্ষার্থীদের গড় খরচ ছিল ৩,৯৭০ টাকা, যা পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীর ব্যক্তিখাতে মোট শিক্ষাব্যয়ের ৪৮.৩ শতাংশ। ব্যক্তিখাতে মোট শিক্ষাব্যয়ের ৩৭ শতাংশেরও বেশি খরচ হয়েছে বিদ্যালয়ের কোচিং, প্রাইভেট পড়া ও এ সংক্রান্ত যাতায়াতের জন্য। এ ক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে, ছেলে ও মেয়েদের খরচের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই এবং গ্রামের পরীক্ষার্থীদের তুলনায় শহরের পরীক্ষার্থীদের জন্য খরচ বেশি। পরীক্ষাসংক্রান্ত খাতে খরচ সবচেয়ে বেশি কিন্ডারগার্টেনের পরীক্ষার্থীদের আর সবচেয়ে কম উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থীদের। পরীক্ষা খাতে খরচের দিক থেকে সর্বোচ্চ চতুর্থাংশ পরীক্ষার্থীদের জন্য যে পরিমাণ খরচ হয়েছে তা প্রথম চতুর্থাংশ পরীক্ষার্থীদের খরচের ৯.৬৩ গুণ।

সমাপনী পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে ব্যক্তিখাতে শিক্ষাব্যয়ের শতকরা বিন্যাস

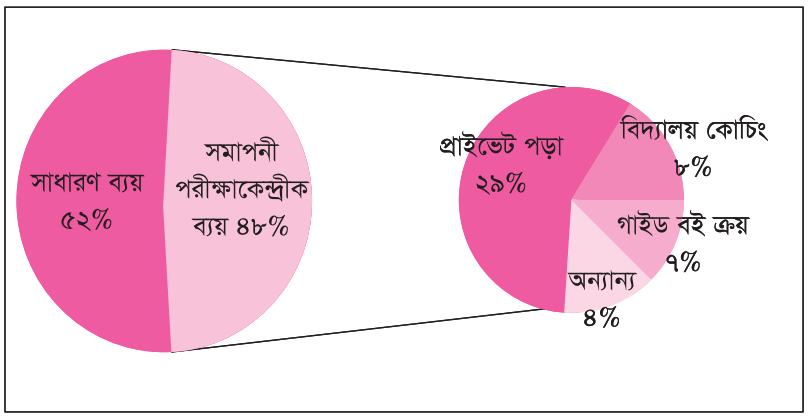

সূত্র: এডুকেশন ওয়াচ প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার্থী জরিপ, ২০১৪

- প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার সঙ্গে সম্পর্কিত খাতসমূহে মোট খরচের ৫৮.৭ শতাংশ খরচ হয়েছে প্রাইভেট পড়তে, ১৭.৪ শতাংশ বিদ্যালয় আয়োজিত কোচিং-এ, ৩.২ শতাংশ পরীক্ষাসংক্রান্ত যাতায়াতে, ২.১ শতাংশ মডেল টেস্টে, ১.৯ শতাংশ পরীক্ষার জন্য নিবন্ধনে, ০.৯ শতাংশ কোচিং/প্রাইভেট পড়ার যাতায়াতে এবং ০.৮ শতাংশ নিবন্ধনের ছবি তোলার

জন্য। যদিও বিদ্যালয় আয়োজিত কোচিং-এর তুলনায় প্রাইভেট পড়ার জন্য ব্যয়িত সময় ছিল কম, কিন্তু খরচের দিক থেকে প্রাইভেট পড়ার খরচ বিদ্যালয়ের কোচিং-এর খরচের তুলনায় অনেক বেশি। আগেরটি পরেরটির ৩.৪ গুণ।

- যেসব পরীক্ষার্থীর মা-বাবা মাধ্যমিক বা তার বেশি পড়ালেখা করেছেন এবং যারা অর্থনৈতিকভাবে উদ্বৃত্ত খানার অধিবাসী তারা পরীক্ষাসংক্রান্ত নানা খাতে অন্যদের তুলনায় অনেক বেশি অর্থ ব্যয় করেছেন।
- সমাপনী পরীক্ষার প্রস্তুতির সহায়ক হিসেবে ৯৬.৪ শতাংশ পরীক্ষার্থী গাইডবই, সাজেসন্স বা হাতে তৈরি নোট কিনেছে। এ কাজে তারা গড়ে ৫৯৪ টাকা খরচ করেছে। এই খরচ পঞ্চম শ্রেণির মোট শিক্ষাব্যয়ের ৭.২ শতাংশ এবং সমাপনী পরীক্ষাসংক্রান্ত ব্যয়ের ১৫ শতাংশ। এ ক্ষেত্রেও বিদ্যালয়ের ধরন ও গ্রাম-শহর অনুসারে পার্থক্য পাওয়া গেছে।
- ব্যক্তিখাতে শিক্ষাব্যয় ও কোচিং/প্রাইভেট পড়ার খরচ সময়ের সাথে বেড়েছে। ব্যক্তিখাতে শিক্ষাব্যয় ২০০০ সাল থেকে ২০০৮ সালে ২.৯৬ গুণ বেড়েছে, কিন্তু একই সময়ে কোচিং/প্রাইভেট পড়ার খরচ বেড়েছে ৩.০৭ গুণ। এই দুই খাতে ২০০৮ সাল থেকে ২০১৪ সালে খরচ বেড়েছে যথাক্রমে ১.০৩ ও ১.৬১ গুণ।

সময়ের সাথে ব্যক্তিখাতে শিক্ষাব্যয় ও কোচিং/প্রাইভেট পড়ার খরচের বৃদ্ধি

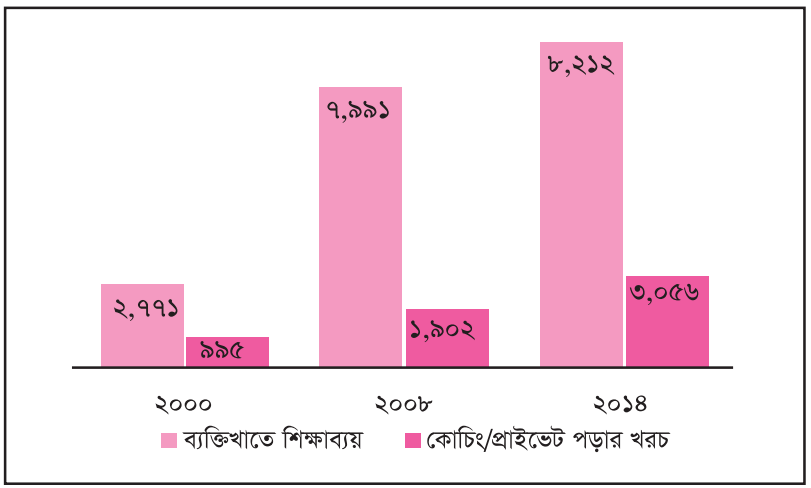

সূত্র: এডুকেশন ওয়াচ প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার্থী জরিপ, ২০১৪

ঘ. গবেষণা থেকে লব্ধ মূল বার্তাসমূহ

এডুকেশন ওয়াচ ২০১৪ গবেষণার ফলাফল পর্যালোচনা করে নিচের মূল বার্তাসমূহ পাওয়া গেছে।

- ***পরীক্ষা-কেন্দ্রিক শিক্ষা ও পড়া মুখস্ত করা এক কঠিন বাস্তবতা:*** সমাপনী পরীক্ষা প্রচলন করার পর থেকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যবস্থা পরীক্ষা-কেন্দ্রিক হয়ে পড়েছে, বিশেষকরে পঞ্চম শ্রেণিতে। পরীক্ষার্থীদের তৈরি করার জন্য দলবদ্ধ কোচিং ও মডেল টেস্ট বিদ্যালয়গুলোর প্রধান কর্মকাণ্ডে পরিণত হয়েছে। এসবের প্রসারে উপজেলা শিক্ষা অফিসও যুক্ত রয়েছে। প্রতিটি শিক্ষার্থীর সঙ্গে শিক্ষকের আলাদাভাবে সংযোগ না ঘটায় শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন মেটানো যাচ্ছে না। প্রশ্নোত্তর মুখস্ত করা পড়ালেখার সমার্থক হয়ে উঠেছে; পাঠ্যবইয়ের বিষয়বস্তু বোঝার ক্ষেত্র খুবই সীমিত হয়ে পড়েছে অথবা একেবারেই নেই।
- ***প্রাইভেট পড়ার ওপর নির্ভরশীলতা বাড়ছে:*** শিক্ষার্থীরা ও তাদের মা-বাবারা বিদ্যালয়ের স্বাভাবিক পড়ালেখা এমনকি বিদ্যালয় আয়োজিত কোচিংয়ের ওপর ভরসা করতে পারছেন না। এর ফলে সকল ধরনের বিদ্যালয়ের এবং গ্রাম-শহর নির্বিশেষে সকল আর্থসামাজিক স্তরের শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রাইভেট পড়ার প্রতি ঝোঁক উদ্বেগজনকভাবে বেড়েছে। প্রাইভেট শিক্ষকদের উল্লেখযোগ্য এক অংশ হলো নিজ বিদ্যালয়েরই শিক্ষকরা; যা আবার সরাসরি প্রভাবিত করছে শ্রেণিকক্ষের স্বাভাবিক শিক্ষণকে। একই মানুষ দুই পরিবেশে দুই রকম আচরণ করেন। যে পরীক্ষার্থীরা নিজ বিদ্যালয়ে বিনামূল্যে আয়োজিত কোচিংয়ে অংশ নেয় তারাও টাকা খরচ করে প্রাইভেট পড়ে। বিদ্যালয় আয়োজিত কোচিংয়ের তুলনায় প্রাইভেট পড়ার খরচ অনেক বেশি, যা সরাসরি শিক্ষাক্ষেত্রে অসমতা ও শিক্ষার অধিকারের সঙ্গে সম্পর্কিত।
- ***গাইডবই পাঠ্যবইকে দূরে ঠেলে দিচ্ছে:*** বেশিরভাগ শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও প্রাইভেট টিউটরের কাছে গাইডবই হলো পড়ালেখা করার প্রধান উপকরণ। তাদের উল্লেখযোগ্য সংখ্যকের কাছে প্রতিটি বিষয়ের জন্য একাধিক প্রকাশনীর গাইডবই রয়েছে। গাইডবইয়ের প্রধান আকর্ষণ হলো, পরীক্ষায় আসতে পারে এমন প্রশ্নের তৈরি উত্তর সেখানে পাওয়া যায়। আরো সুবিধা হলো পাঠ্যবই কিংবা সহযোগী উপকরণ না পড়ে অথবা নিজ থেকে উত্তর তৈরি করার চেষ্টা না করে সহজেই মুখস্থবিদ্যা চর্চা করা যায়। পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের ধরন ও শিক্ষার্থীদের উত্তরপত্র এবং এগুলোর ওপর গবেষণা ও পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণের অভাব এই প্রবণতাকে বাড়িয়ে তুলেছে। এ ধরনের পরিস্থিতি সরকারের 'সবার জন্য বিনামূল্যের পাঠ্যবই' নীতিকে প্রশ্নের মুখে ঠেলে দিচ্ছে এবং একই সঙ্গে এগুলোর যথাযথ ব্যবহারও প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে।

- ***অসদুপায় অবলম্বন ও অনৈতিকতা শিখতে শিক্ষার্থীরা প্ররোচিত হচ্ছে:*** প্রস্তুতি যেমনই থাকুক না কেন কিংবা অসদুপায় অবলম্বন করে যে কোনো মূল্যে বেশি নম্বর পাওয়ার যত আয়োজনই থাকুক না কেন, বেশিরভাগ পরীক্ষার্থী বিঘ্নহীন ও পক্ষপাতমুক্ত পরিবেশে পরীক্ষা দিতে চায়। যদিও পরীক্ষার্থীদের একটি অংশ শিক্ষক ও পরীক্ষা সংগঠকদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সহায়তায় যে কোনো মূল্যে অধিক নম্বর পেতে সচেষ্ট। এরা পরীক্ষার হলের বাইরে প্রশ্নপত্র ফাঁসসহ অসদুপায় অবলম্বন করা ও যথাযথ আচরণ না করার সঙ্গে জড়িত। শিক্ষা অফিস, বিদ্যালয়, পরীক্ষার হল, কোচিং সেন্টার সবাই এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত। পরীক্ষার্থীদের একটি অংশের বাধাহীন অসদুপায় অবলম্বন ও নকল করার মহোৎসব বাকি সবার ওপর খারাপ প্রভাব ফেলছে। এসব বন্ধে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ না করা ও অপরাধীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলকব্যবস্থা না নেওয়ায় শিক্ষার্থীদের কাছে তা খারাপ উদাহরণ হিসেবে উপস্থাপিত হয়।

- ***সমাপনী পরীক্ষা শিক্ষার্থীদের শিখন পরিমাপে কেবলমাত্র মধ্যম মানের ক্ষমতা রাখে:*** সমাপনী পরীক্ষার ফলাফল ও এডুকেশন ওয়াচ প্রবর্তিত প্রান্তিক যোগ্যতাভিত্তিক পরীক্ষার ফলাফলের মধ্যে যোগবোধক সম্পর্ক সমাপনী পরীক্ষার শিখনদক্ষতা পরিমাপের মধ্যম মানের ক্ষমতা প্রমাণ করে। যদিও এ ধরনের পরীক্ষার শিখনদক্ষতা পরিমাপের উচ্চ মানের ক্ষমতাই প্রত্যাশিত।

- ***প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক হ'লেও বিনামূল্যের নয়, বরঞ্চ উচ্চ মূল্যের:*** প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ব্যক্তিখাতে ব্যয় সময়ের আবর্তে অনেক বেড়েছে। এর বড় অংশই ব্যয় হয় প্রাইভেট পড়তে, বিদ্যালয় আয়োজিত কোচিংয়ে এবং গাইডবই, সাজেসন্স ও নোট কিনতে। এসব কর্মকাণ্ড বর্তমানে প্রচলিত শ্রেণিকক্ষের পড়ালেখা, সবার জন্য অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা ও প্রাথমিক শিক্ষায় ভর্তুকি নীতির ধারণাকে প্রশ্নের মুখোমুখি করছে।

- ***পুরো ব্যবস্থাজুড়ে বৈষম্য বিরাজমান:*** বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষায় বিদ্যালয়ের ধরন, গ্রাম-শহর, জেন্ডার, শিক্ষার্থীদের আর্থসামাজিক পটভূমি, ব্যক্তিখাতে শিক্ষাব্যয় ইত্যাদিভেদে সর্বত্র অসমতার বিচরণ। নতুন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থীরা সবচেয়ে খারাপ করেছে, যেমন খারাপ করেছে এবতেদায়ি মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরাও। সমাপনী পরীক্ষার ফলাফলকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করেছে ব্যক্তিখাতে শিক্ষাব্যয়। খানা পর্যায়ের অসমতা বিদ্যালয় পর্যায়ের অসমতা সৃষ্টির সহায়ক।

ঙ. উপসংহার

এই গবেষণার উপসংহার দুটো:

- প্রাথমিক শিক্ষাচক্র শেষে অনুষ্ঠিত সমাপনী পরীক্ষা কতগুলো দৃশ্যমান পরিবর্তনের সূচনা করেছে। উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনটি হলো, এই পরীক্ষা শিক্ষার্থীদের পড়ালেখার প্রতি অধিকতর যত্নবান হতে শিক্ষার্থী, তাদের মা-বাবা ও শিক্ষকদের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে পেরেছে। দুঃখজনক হলো, এর জন্য বেশ কিছু মূল্যও দিতে হয়েছে। এই গবেষণা দেখিয়েছে যে, বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষাকে কীভাবে 'শিখন-কেন্দ্রিক' না করে অধিকতর 'পরীক্ষা-কেন্দ্রিক' করা হয়েছে। এ ফলে শিশুরা শেখার আনন্দ পেতে ও সৃজনশীল হওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। সমাপনী পরীক্ষা শিক্ষার্থীদের শিখন পরিমাপ করা ও প্রাথমিক শিক্ষার মান বাড়ানোর ক্ষেত্রে বড় ধরনের এক উদ্যোগ– সরকারের এ ধরনের অবস্থানের সঙ্গে একমত পোষণ করা কষ্টসাধ্য। একইরকমভাবে এটাও মানা যায় না যে, বিগত বছরগুলোতে সমাপনী পরীক্ষার পাশের হারের বৃদ্ধি প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষণ-শিখনের মান বাড়ার নির্দেশক।

- প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা শিক্ষার্থীদের শিখনের মূল্যায়নসম্পর্কিত বিতর্ককে একেবারে আলোচনার কেন্দ্র বিন্দুতে নিয়ে এসেছে। এর ফলে প্রাথমিক শিক্ষার প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধন, শিখন মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার পরিবর্তন ও এ সম্পর্কিত নানা বিষয়ে কাজ করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এ সুযোগ কতটা কাজে লাগানো হবে তা নির্ভর করছে বিষয়গুলোতে মুক্তমনা হতে নীতিপ্রণেতাদের ইচ্ছা কতটুকু রয়েছে তার ওপর। একইসঙ্গে গবেষণার ফলাফল, বিষয়সম্পর্কিত কারিগরি জ্ঞান ও পেশাগত উপদেশ নিতে তাদের আগ্রহ কতটুকু রয়েছে তাও এর সঙ্গে সম্পর্কিত।

চ. নীতিসংক্রান্ত সুপারিশমালা

এই গবেষণার ফলাফল, উপসংহার ও মূল বার্তাসমূহ বিশ্লেষণ করে *এডুকেশন ওয়াচ* গ্রুপ জোরের সঙ্গে সমাপনী পরীক্ষার সূত্র ধরে বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপক সংস্কার সাধনের সুপারিশ করছে। শিখনকে শিক্ষাব্যবস্থার মূলে স্থাপন করে সংস্কার কার্যক্রম পরিচালিত হওয়া দরকার– শিক্ষকদের ক্ষমতায়নের পটভূমিতে, শ্রেণিকক্ষের শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়াকে শক্তিশালী করে, সমাপনী পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন ও অনৈতিকতাকে সমূলে উৎপাটন করে, শিক্ষা প্রশাসনকে বিকেন্দ্রীকরণ করে এবং শিক্ষায় প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ নিশ্চিত করে।

১. ***শ্রেণিকক্ষের শিক্ষণ-শিখনের মান বাড়ানোর জোর প্রচেষ্টা দরকার:*** বিদ্যালয়গুলো যেন বাধ্যতামূলকভাবে সারা বছর প্রতিটি শ্রেণিতে নিয়মিত রুটিন অনুসরণ করে শ্রেণির কাজ পরিচালনা করে সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে। বিদ্যালয়ভিত্তিক কোচিং কেবলমাত্র প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা হিসেবে থাকতে পারে; কোনোভাবেই সমাপনী পরীক্ষার প্রস্তুতির নামে মুখস্ত করার যন্ত্র হিসেবে নয়। পঁয়ত্রিশ থেকে ৪০ মিনিটের ক্লাসের সময় (পিরিয়ড) ও সব বিষয়কে সমান গুরুত্ব দিয়ে যান্ত্রিকভাবে তৈরি রুটিন অনুসরণ করার পরিবর্তে পড়া, লেখা ও গণিতের শ্রেণিভিত্তিক মৌলিক দক্ষতাসমূহ বৃদ্ধিতে অধিকতর সময় দেওয়ার বিষয় বিবেচনা করা আবশ্যক। রুটিনসংক্রান্ত এসব কাজ সৃজনশীলভাবে করার জন্য শিক্ষকদের প্রস্তুতির বিষয়টিও বিবেচনায় নিতে হবে। সার্বিকভাবে, শিক্ষার্থী-শিক্ষক সংযোগ সময় বাড়ানো দরকার এবং কার্যকর সংযোগ সময় আন্তর্জাতিক স্তরে নেওয়া উচিত– বছরে প্রায় এক হাজার ঘণ্টা। প্রতিটি শ্রেণির শিক্ষার্থী সংখ্যা এমনভাবে নিরূপিত হওয়া দরকার যেন তা কার্যকর শিক্ষণ-শিখনের সহায়ক হয়।

২. ***সমাপনী পরীক্ষার উচ্চ-প্রতিযোগিতামূলক চরিত্রে পরিবর্তন আনা একান্ত প্রয়োজন:*** বর্তমানে প্রচলিত প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার চরিত্র উচ্চ-প্রতিযোগিতামূলক। স্বেচ্ছায় বা দৈবভাবে ঘটুক না কেন, এটি শিক্ষার্থী, তাদের মা-বাবা, বিদ্যালয় ও উপজেলা শিক্ষা কর্তৃপক্ষের উদ্বেগ ও মর্মপীড়ার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। পৃথিবীর বেশিরভাগ দেশই এসব বিষয়ে উদ্বিগ্ন এবং এর কোনো সহজ সমাধান নেই। সমাপনী পরীক্ষার প্রচলিত নিয়ম হলো প্রতিটি শিক্ষার্থীকে গ্রেডিং করা। এর পরিবর্তে পদ্ধতির দক্ষতার পুঙ্খানুপুঙ্খ মূল্যায়ন এবং অসমতার বিশ্লেষণ প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে অধিকতর অবদান রাখতে পারে। সমাপনী পরীক্ষার সংস্কারে বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত জাতীয় কৃতী অভীক্ষাসহ অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতা কাজে লাগানো যেতে পারে। আন্তর্জাতিকভাবে, এত কম বয়সে জাতীয়ভিত্তিক পরীক্ষা একটি দুর্লভ ঘটনা। শিক্ষানীতির দিকনির্দেশনা অনুসারে বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষা যেহেতু অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত বিস্তৃত হচ্ছে তাই এ ধরনের পরীক্ষা অষ্টম শ্রেণির শেষে হওয়া উচিত।

৩. ***বিদ্যালয় ও পরীক্ষার হলে অসদুপায় অবলম্বন করা বন্ধ করতে হবে:*** এটি পরীক্ষার উচ্চ-প্রতিযোগিতামূলক চরিত্র, এবং এর ফলে শিশুমনে, তাদের আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে ও সার্বিকভাবে শিক্ষাব্যবস্থায় কী ধরনের প্রভাব পড়তে পারে সে সম্পর্কে সংশ্লিষ্টদের সংবেদনশীলতার অভাবের কারণে ঘটছে। পরীক্ষার প্রকৃতি পুনমূল্যায়নের পাশাপাশি পরীক্ষাসম্পর্কিত নিয়মকানুন ও বিধিবিধান আরও পরিষ্কারভাবে বিধৃত হওয়া দরকার এবং তা সর্বত্র স্বচ্ছ ও সমভাবে প্রয়োগ করা উচিত। সমাপনী পরীক্ষার প্রকৃত ফলাফল গ্রহণ করতে কর্তৃপক্ষের মানসিক প্রস্তুতিও এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ গ্রহণ করার পর ধর্মশিক্ষার সঙ্গে নৈতিক শিক্ষাও যুক্ত করা

হয়েছে। কিন্তু আমরা শিক্ষার্থীদের সামনে অনাচার ঘটছে জেনেও আমাদের দৃষ্টি অন্যদিকে ফিরিয়ে রেখেছি। আমাদের পরের কাজটির অবস্থান প্রথম কাজের সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী।

৪. ***শিক্ষকদের সহায়তা প্রদান, সম্মান ও ক্ষমতায়নের প্রতি জোর দেওয়া প্রয়োজন:*** শিক্ষার্থীদের সঙ্গে শিক্ষকরাও থাকবেন শিক্ষাব্যবস্থার কেন্দ্রস্থলে। শিক্ষকদের প্রকৃত দায়িত্ব সম্পর্কে সজাগ রাখা ও তাদের সজাগ থাকতে সাহায্য করা, শেখানোর জন্য তাদের শিক্ষণের যথাযথ দক্ষতা নিশ্চিত করা এবং এমন ব্যবস্থা করা শিক্ষকরা যেন বিদ্যালয়ে তাদের দক্ষতা প্রকাশের সুযোগ পান– এসবই যে কোনো শিক্ষাব্যবস্থার মূল অনুঘটক। শিক্ষার্থীদের শিখনের প্রাত্যহিক ও সমাপনী মূল্যায়ন শিক্ষকদের অন্যতম প্রধান কাজ। শিক্ষার্থী মূল্যায়নের পদ্ধতিতে 'প্রাত্যহিক' ও 'সমাপনী' উভয় ধরনের মূল্যায়নের স্থান থাকা দরকার এবং শিক্ষকরা যেন তাদের দায়িত্ব ঠিকভাবে পালন করতে পারেন তার যথাযথ পরিবেশ নিশ্চিত করা দরকার। দূর থেকে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি ও প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের নিয়ম ও বিধিবিধান পালন করা তাদের কাজ হওয়া উচিত নয়। পরীক্ষার মানদণ্ড ও নিয়মকানুন এবং প্রশ্নপত্র তৈরি ও উত্তরপত্র মূল্যয়ন করতে শিক্ষকদের আরও ব্যাপকভাবে কাজে লাগানো যায়। বৃহত্তর সমাজ যেন শিক্ষার্থীদের পর্যাপ্ত শিখনের লক্ষ্যে, শিক্ষণ ও মূল্যায়নের ক্ষেত্রে শিক্ষকদের দক্ষতার ওপর ভরসা রাখতে পারে তা নিশ্চিত করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

৫. ***সমাপনী পরীক্ষাকে জাতীয়'র পরিবর্তে স্থানীয়ভাবে পরিচালনা করার উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন:*** বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর তার সীমিত লোকবল নিয়ে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সর্বজনীন পরীক্ষা পরিচালনা করছে। সমাপনী পরীক্ষার ব্যবস্থাপনাকে সহজ করার লক্ষ্যে এটিকে উপজেলা পর্যায়ে বিকেন্দ্রীকরণ করা দরকার। যার মধ্যে রয়েছে, প্রশ্নপত্র তৈরি, পরীক্ষা পরিচালনা, উত্তরপত্র মূল্যায়ন ও ফলাফল প্রকাশ করা। বিকেন্দ্রীকরণের প্রথম ধাপ হিসেবে জাতীয়ভাবে সমমানের একাধিক প্রশ্নপত্রের সেট তৈরি করা যেতে পারে। এর ফলে জাতীয় বেইসলাইন তৈরি করতে সুবিধা হবে। তারপর সেগুলো দৈবচয়নের ভিত্তিতে পরীক্ষার ঠিক আগে উপজেলাগুলোতে পরীক্ষা নেওয়ার জন্য পাঠানো উচিত। এ ধরনের একটি প্রচেষ্টা পঞ্চম শ্রেণিতে উপজেলাভিত্তিক পরীক্ষা নেওয়ার যে প্রস্তাব জাতীয় শিক্ষানীতিতে করা হয়েছে তার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হবে। শেষ পর্যন্ত, উপজেলা শিক্ষা অফিসসমূহকে এমনভাবে সংগঠিত ও দক্ষ মানবসম্পদ দিয়ে গড়ে তুলতে হবে যেন সেখানে স্বাধীনভাবে সমাপনী পরীক্ষাসংক্রান্ত সমস্ত কাজ করা সম্ভব হয়। যদিও, স্থানীয় সরকার, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি ও জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের সহযোগিতা ও তদারকির ভূমিকা প্রয়োজন হবে সবসময়ই। প্রসংগত উল্লখ করা যেতে পারে যে, স্থানীয় উদ্যোগে পরিচালিত এ ধরনের পরীক্ষা পদ্ধতি ইতোপূর্বে বেশ কয়েকটি উপজেলায় চালু ছিল।

৬. ***সমাপনী পরীক্ষার প্রশ্নপত্র সম্পূর্ণভাবে প্রান্তিক যোগ্যতাভিত্তিক করা প্রয়োজন:*** দেশে প্রান্তিক যোগ্যতাভিত্তিক প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা চালু হয়েছে প্রায় আড়াই দশক আগে। কিন্তু শিক্ষার্থী মূল্যায়ন পদ্ধতি রয়ে গেছে পুরানো ধাঁচে। সমাপনী পরীক্ষাকে ক্রমান্বয়ে প্রান্তিক যোগ্যতাভিত্তিক করার একটা উদ্দেশ্য তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচিতে (পিইডিপি ৩) রয়েছে। কাজটি শুরু হয়েছে, এটা দ্রুত সম্পন্ন করা দরকার। উপজেলা পর্যায়ে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার বিকেন্দ্রীকরণ এ ক্ষেত্রে কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে না। কারণ, উপজেলা কর্তৃপক্ষ প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি ও জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের তত্ত্বাবধানে কাজ করবে। প্রশ্নপত্র তৈরির ক্ষেত্রে উদ্ভাবনী ক্ষমতা দেখাতে পারলে তা গাইডবইয়ের ওপর শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের নির্ভরশীলতা কমাতে সহায়ক হবে।

৭. ***শিক্ষাসংশ্লিষ্ট সবধরনের ব্যক্তিবর্গ ও প্রতিষ্ঠানের অভিজ্ঞতা কাজে লাগানোর কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন:*** ইতোমধ্যে ছয় বছর অতিক্রান্ত হয়েছে এবং ছয়টি প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই ছয় বছরে প্রাথমিক শিক্ষাসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও প্রতিষ্ঠান যেমন, পরীক্ষার্থী, শিক্ষক, পরীক্ষার্থীর মা-বাবা ও অভিভাবক, বিভিন্নস্তরের শিক্ষা কর্মকর্তাগণ, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সমাপনী পরীক্ষার ওপর অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে। এ ছাড়াও শিক্ষাবিদ, গবেষক, নাগরিক সমাজ ও গণমাধ্যম নিজ নিজ অভিজ্ঞতার আলোকে বিভিন্ন সময়ে মতামত তুলে ধরেছে। প্রস্তাবিত সংস্কার কার্যক্রমে এই অভিজ্ঞতাগুলোকে মূল্য দেওয়া উচিত। ভবিষ্যৎ দিক-নির্দেশনা প্রস্তুত করার সময় এই অভিজ্ঞতাগুলো ধারণ করার জোর সুপারিশ করা হচ্ছে। অভিজ্ঞতার কিছু বিবরণ এই গবেষণায় উঠে এসেছে যা থেকে কাজটি শুরু করা যায়। কিন্তু এর বাইরেও অভিজ্ঞতা থাকতে পারে। সমন্বিত উদ্যোগ শুধু যে সংস্কার কার্যক্রমকে ফলপ্রসু করবে তাই নয়, একই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মহলে ব্যাপক ঐক্য গড়ে তুলতেও সহায়ক হবে, যা বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থার জন্য খুবই প্রয়োজন।

গবেষণায় যারা বিভিন্নভাবে সম্পৃক্ত

স্যার ফজলে হাসান আবেদ কেসিএমজি[১]
ড. কাজী খলিকুজ্জমান আহমদ[১]
অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ[২,৫]
কবির আহমেদ[২]
ড. মনজুর আহমদ[১,৪,৬]
চৌধুরী মুফাদ আহমেদ২
অধ্যাপক কাজী সালেহ্ আহমেদ[১,৪,৫]
রমিজ আহমেদ[৩]
রিফাত আফরোজ[৪]
অধ্যাপক শফি আহমেদ[১]
তাহ্সিনা আহমেদ[২]
জসিমউদ্দিন আহমেদ[৩]
অধ্যাপক কফিল উদ্দিন আহমেদ[৩]
অধ্যাপক জাহেদা আহমেদ[১]
যেহীন আহমেদ[১]
মাহমুদা আকতার[২]
সৈয়দা তাহ্মিনা আকতার[৩]
ড. মাহ্মুদুল আলম[২]
অধ্যাপক এস. এম. নূরুল আলম[১]
কাজী রফিকুল আলম[১]
অধ্যাপক সৈয়দ সাদ আন্দালিব[১]
অধ্যাপক মো: শফিউল আলম[২]
অধ্যাপক মুহম্মদ আলী[৩]
খন্দকার সাখাওয়াত আলী[২]
রুহুল আমিন[৩]
মোহাম্মদ নিয়াজ আসাদউল্লাহ[১]
ড. মো: আসাদুজ্জামান[১]
অধ্যাপক আলী আজম[৩]
ড. আনোয়ারা বেগম[২, ৫]
ড. আব্বাস ভূইয়া[১]
রাশেদা কে. চৌধূরী[১,৪,৬]
জীবন কুমার চৌধুরী[১]
ড. মো.ফজলুল করিম চৌধুরী[১]
ড. আহমদ মোশ্তাক রাজা চৌধুরী[১,৪,৬]
তানজীবা চৌধুরী[৪]
হরিপদ দাশ[২]
সুব্রত এস. ধর[১]
ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন[১]
এস এ হাসান আল-ফারুক[২]
জাকী হাসান[১,৫]
সামসে আরা হাসান[১]
অধ্যাপক মুহাম্মদ নাজমুল হক[২]
কে. এম. এনামুল হক[২]
ড. এম. সামছুল হক[৩]
মো: আলতাফ হোসেন[৩]
মো: আনোয়ার হোসেন[৪]
ইকবাল হোসেন[২]
মো: মোফাজ্জল হোসেন[২]
ড. এম. আনোয়ারুল হক[১]
ড. মুহাম্মদ ইব্রাহিম[১]
অধ্যাপক মো: রিয়াজুল ইসলাম[৩]
ড. শফিকুল ইসলাম[২]
রওশন জাহান[১]
ড. আহমেদ-আল-কবির[১]
মো: হুমায়ূন কবির[১]
ইফতিখার উল করিম[৪]
নুরুল ইসলাম খান[২]
অধ্যাপক মাহ্ফুজা খানম[১]
ড. আবু হামিদ লতিফ[১]
সিমিন মাহমুদ[২]
তালাত মাহমুদ[২]
উৎপল মল্লিক[৪]
অঞ্জনা মংগলাগিরি[১]
ড. ইরাম মরিয়ম[২]
নওরা মেহরীন[৪]
ড. আহমদুল্যাহ মিয়া[২]
মোহাম্মদ মহসিন[২]
ড. মো: গোলাম মোস্তফা[২]
ড. কে. এ. এস. মুরশীদ[১]
সমীর রঞ্জন নাথ[২,৪,৬]
এলিজাবেথ পিয়ারেস[২]
মো: আবদুর রফিক[২]
জওশন আরা রহমান[১]

ড. এম. এহছানুর রহমান[২]
কাজী ফজলুর রহমান[১]
ম. হাবিবুর রহমান[২, ৫]
আ. ন. স. হাবিবুর রহমান[৩]
অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান[১]
ড. ছিদ্দিকুর রহমান[২]
এ. এন. রাশেদা[১]
তালেয়া রেহমান[১]
গৌতম রায়[৩]
অধ্যাপক রেহমান সোবহান[১]
ড. নিতাই চন্দ্র সুত্রধর[১]
মোহাম্মদ মুনতাসিম তানভীর[২]

১. উপদেষ্টা বোর্ড সদস্য
২. কর্মদল সদস্য
৩. টেকনিক্যাল টিম সদস্য
৪. প্রতিবেদন প্রণয়নকারী
৫. রিভিউ টিম সদস্য
৬. সম্পাদনা টিম সদস্য